सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

''আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।''

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

সমাজ বিজ্ঞান

সমকালীন ভারত - ১

নবম শ্রেণির ভূগোল পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

ত্রিপুরা সরকার।

©এন সি ই আর টি কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সমাজ বিজ্ঞান

সমকালীন ভারত - ১

নবম শ্রেণির ভূগোল পাঠ্যবই

(এন সি ই আর টি-র Social Science Contemporary India - 1 পাঠ্য পুস্তকের ২০১৭ সালের অনূদিত সংস্করণ)

এস সি ই আর টি
অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮.

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ : অরূপ চৌধুরী

প্রকাশক : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

মূল্য : ৫৫.০০ টাকা

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড,
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

অক্ষর বিন্যাস

অরূপ চৌধুরী
শিক্ষক

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক,
এন ই আর আই ই, শিলং (এন সি ই আর টি)
ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক,
আর আই ই, ভুবনেশ্বর (এন সি ই আর টি)

শ্রীমতি অর্পা রায় চৌধুরী, শিক্ষিকা
শ্রীমতি গৌরি মজুমদার (ধর), শিক্ষিকা
শ্রী সুরজিৎ দেবনাথ, শিক্ষক
শ্রীমতি ভাস্বতী সেনগুপ্ত (দেবনাথ), শিক্ষিকা
শ্রমিতি শর্মিলা দেব্বর্মা, শিক্ষিকা
শ্রীমতি পূজাঞ্জলি ভৌমিক, শিক্ষিকা

শ্রীমতি গৌরি মজুমদার (ধর), শিক্ষিকা
শ্রী প্রবুদ্ধসুন্দর কর, শিক্ষক

প্রাক্‌কথা

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুলজীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল, বাড়ি এবং সম্প্রদায়— এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে. এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং চারদেয়ালের মধ্যে তীব্রভাবে আবদ্ধ করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার প্রবণতা আবদ্ধ করে বিভিন্ন শিক্ষার করার বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যাঁরা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন আশা অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে। ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে না, সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং কীভাবে সেই পড়ার মূল্যায়ন করবেন। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়, এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রাক্‌কথা

পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বইটি রূপায়ন করেছেন তাঁদেরকে এন সি ই আর টি প্রশংসা জানাচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক যোগেন্দ্র যাদব এবং অধ্যাপক সুহাস পাল মহোদয়গণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপাণ্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর ২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks in Social Science at the Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisor

M. H. Qureshi, *Professor,* CSRD, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Members

K. Jaya, *PGT,* Convent of Jesus and Mary, Bangla Sahib Road, New Delhi

Punam Behari, *Reader*, Miranda House, Chhatra Marg, University of Delhi, Delhi

Saroj Sharma, *TGT* (*Retd.*), Mother's International School, Sri Aurobindo Marg, New Delhi

Sudeshna Bhattacharya, *Reader,* Miranda House, Chhatra Marg, University of Delhi, Delhi

Member-Coordinator

Tannu Malik, *Lecturer,* DESSH, NCERT, New Delhi

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ১৪-৩০ ৩২ও ২২৬)

১) সাম্যের অধিকার:

* আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।
* জাতি,ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
* সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
* অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

২) স্বাধীনতার অধিকার :

* বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
* শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
* সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
* ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
* ভারতের যেকোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
* যে-কোনো জীবিকা, পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার।
* জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার:

* কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
* চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্যকোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

* সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা, কারোর প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না এবং প্রত্যেক ধর্মাচরণের পূর্ণ অধিকার এবং সমানাধিকার পাবে।
* যেকোনো ধর্মের প্রসারে অর্থ দান করার স্বাধীনতা।
* রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্মের ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যাবে না।
* সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ও তাতে যোগদানের স্বাধীনতা।
* ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো নিজেদের পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার :

* ভারতের যেকোনো নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা-লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে।
* ধর্ম জাতি বা ভাষার দরুন কাউকে সরকারি অথবা সরকারি যাহায্য প্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৬) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার :

* মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টে ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে– প্রয়োজনে বিশেষ লেখ জারি করতে পারবে।
  হেবিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, সারশিয়োরেরাই, প্রহিবিশন ও কুয়ো ওয়ারান্টো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, সি এস আর ডি, জে এন ইউ-এর অধ্যাপক শ্রী বি.এস. বুটোলা, পাটনার স্যার জি.ডি. পাটলিপুত্র ইন্টার স্কুলের স্যার জীবাছ সিং (পিজিটি, ভূগোল), বেরেলি কে ভি এ এফ এস-এর কৃষ্ণকুমার উপাধ্যায়ের (পিজিটি, ভূগোল) প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

এই পাঠ্যবই প্রস্তুতের প্রতিটি স্তরে তাঁর মূল্যবান সহযোগিতা দানের জন্য অধ্যাপক এবং ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন ইন সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ-এর বিভাগীয় প্রধান শ্রীমতী সবিতা সিন্‌হার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়।

বিভিন্ন স্থিরচিত্র এবং অলঙ্করণ দিয়ে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিও পর্ষদ কৃতজ্ঞ :

এম.এইচ. কুরেশি, অধ্যাপক সিএসআরডি, চিত্র ২.৭, এর জন্য আইটিডিসি/পর্যটন মন্ত্রক, চিত্র ২.৬, ২.৮, ২.৯, ২.১১, ৩.৫ এবং ৪.১ নদীর ছবি, ২৩, ৪৮ এবং ৫১ পৃষ্ঠায় মনটেন বনাঞ্চলের পরিযায়ী পাখির ছবির জন্য, ১ নং প্রচ্ছদের মরুভূমির ছবি, চতুর্থ প্রচ্ছদে মেঘের ছবির জন্য ক্রস সেকশন ইন্টারেকটিভ; ৪৮ নং পৃষ্ঠায় সিংহের ছবির জন্য, আন্দামান এবং নিকোবর পর্যটন দপ্তর, ভারত সরকার; চিত্র ২.১১ এর জন্য ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তর, চিত্র ২.৫, ৩.৬; 15 নং পৃষ্ঠায় প্রবালের ছবি; ১ নং প্রচ্ছদে বনের ছবি ফটো ডিভিশন, ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তর ; চিত্র ২.১০ এর জন্য। বিজনেস লাইন চিত্র ৩.২ এর জন্য হিন্দুস্তান টাইমস, নতুন দিল্লি; পৃষ্ঠা ৩৮ এবং ৫০ এর সংবাদ সম্বলিত কোলাজের জন্য

শ্রীঅনিল শর্মা এবং অরবিন্দ শর্মা এই দুই ডিটিপি অপারেটরের অবদান পর্ষদ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে। কম্পিউটার সমীর খাতানা এবং অমর কুমার প্রুষ্টি, প্রুফ রিডার শ্রেষ্ঠা এবং দীপ্তি শর্মা, কম্প্যুটার স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দীনেশ কুমার — যাঁরা বইটির চূড়ান্ত রূপদানের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন — তাঁদের প্রতি পর্ষদ কৃতজ্ঞতা জানায়। এন সি ই আর টি-এর প্রকাশনা বিভাগকেও কৃতজ্ঞতা জানায়।

এই বইয়ে ব্যবহৃত ভারতীয় মানচিত্রের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রযোজ্য

© ভারত সরকার, কপিরাইট (স্বত্ব) ২০০৬

১ আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয় (Details) এবং শুদ্ধতার দায় প্রকাশকের.

২. যথাযথ ভিত্তিরেখা সমুদ্রে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ভারতীয় ভূমি হতে সমুদ্রে প্রবাহিত জলপ্রবাহের অধিকার ভারতের।

৩. চণ্ডীগড়, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের প্রশাসনিক প্রধান কার্যালয় চণ্ডীগড়ে।

৪. অরুণাচল প্রদেশ, আসাম এবং মেঘালয়ের মধ্যে আন্তরাজ্য সীমানা দেখানো হয়েছে 'নর্থ-ইস্টার্ন অ্যরিয়াজ (রিঅর্গানাইজেশন) ধারা, ১৯৭১' মোতাবেক। যদিও তা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

৫. ভারতের সীমারেখা এবং সমুদ্র উপকূলের সীমা সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় (ভারতীয় জরিপ বিভাগ) এর দ্বারা প্রত্যয়িত রেকর্ড/মাস্টার কপি মোতাবেক দেখানো হয়েছে।

৬. উত্তরাঞ্চল ও উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার ও ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যেকার সীমানা সংশ্লিষ্ট সরকারের দ্বারা পরীক্ষিত নয়।

৭. এই মানচিত্রে ব্যবহৃত নামের বানান বিভিন্ন সূত্র হতে নেওয়া হয়েছে।

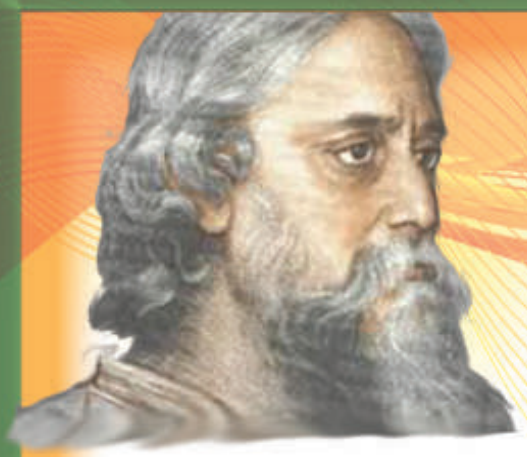

আমাদের জাতীয় সংগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা !
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয়, জয় হে ।।

আমাদের জাতীয় সংগীত মূলত বাংলা ভাষায় রচনা করেন কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং পরবর্তী সময় অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে এর হিন্দি সংস্করণ ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়।

সূচিপত্র

ভূমিকা	
অধ্যায় - ১ ভারত - আয়তন ও অবস্থান	১ - ৬
অধ্যায় - ২ ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ	৭ - ১৬
অধ্যায় - ৩ জলনিকাশি ব্যবস্থা (নদনদী)	১৭ - ২৫
অধ্যায় - ৪ জলবায়ু	২৬ - ৪১
অধ্যায় - ৫ স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী	৪২ - ৫২
অধ্যায় - ৬ জনসংখ্যা	৫৩ - ৬২
অধ্যায় - ৭ পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরা	৬৩ - ৬৬
শব্দ কোশ	৬৭ - ৬৮

১

ভারত – আয়তন ও অবস্থান
(India - Size and Location)

ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। গত পাঁচ দশক ধরে ভারতে আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে সাথে বহুবিধ উন্নতি সাধিত হয়েছে। কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানসহ অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে ভারত এগিয়ে চলছে। এই অগ্রগতির ফলে বিশ্বজগতে ভারত আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

অবস্থান (Location) :

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। মূল ভূখণ্ড—টি উত্তর গোলার্ধে ৮°৪′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩৭°৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৭′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯৭°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত (চিত্র ১.১)। কর্কটক্রান্তি রেখাটি (২৩°৩০′ উত্তর) এই দেশকে প্রায় সমান দুটো ভাগে ভাগ করেছে।

মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আরবসাগরে লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জটি রয়েছে। মানচিত্র দেখে এই দ্বীপপুঞ্জগুলিকে চিহ্নিত করো।

জান কি ? ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণতম স্থলবিন্দু "ইন্দিরা পয়েন্ট" ২০০৪ সালে সুনামিতে সমুদ্রের তলায় চলে গিয়েছিল।

আয়তন (Size) : বিশাল আকৃতির এই ভারতের আয়তন ৩·২৮ মিলিয়ন (প্রতি দশ লক্ষ = এক মিলিয়ন) বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ২·৪ শতাংশ জুড়ে ভারত রয়েছে।

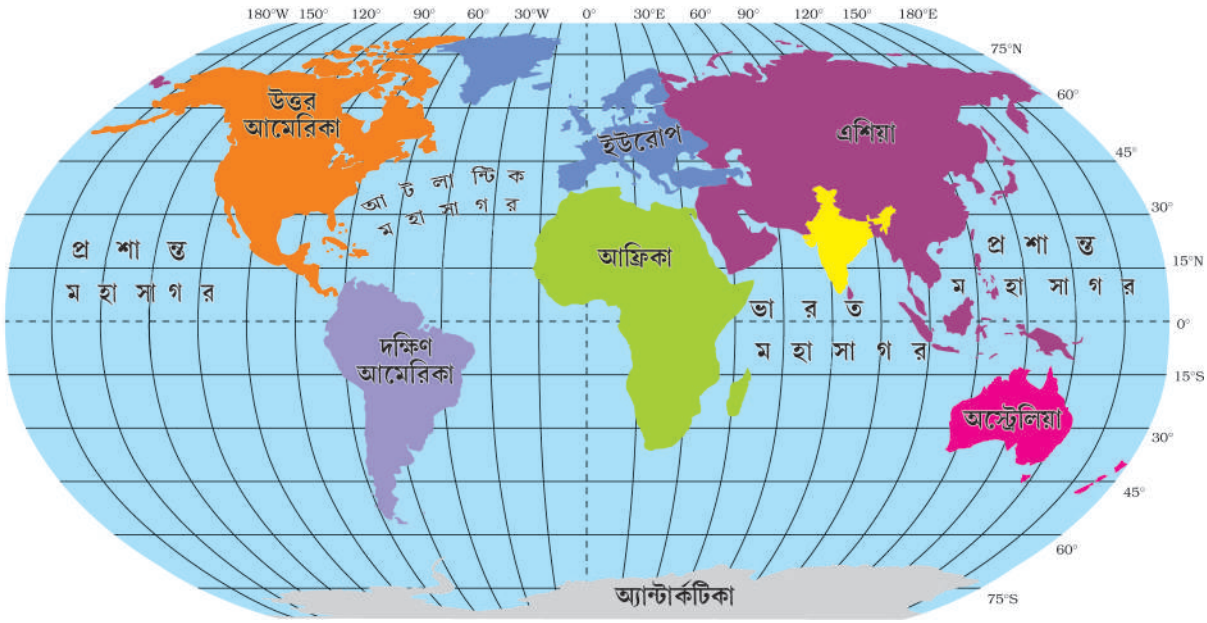

চিত্র ১.১ : পৃথিবীতে ভারতের অবস্থান।

চিত্র ১.২ থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপের ৭৫১৬·৬ কিলোমিটার উপকূলভাগসহ ভারতের মোট উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য ১৫,২০০ কিলোমিটার।

ভারত উত্তরপশ্চিম, উত্তর এবং উত্তরপূর্বদিকে নবীন ভঙ্গিলপর্বত হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণে প্রায় ২২° উত্তর অক্ষাংশ থেকে এই ভূ-খণ্ড ক্রমশ সরু হয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে প্রসারিত হয়েছে এবং দু'দিকে দুটো সাগর অর্থাৎ পশ্চিমদিকে আরবসাগর এবং পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত।

চিত্র নং ১.৩ দেখো এবং লক্ষ করবে যে, মূল ভূখণ্ডটিতে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাগত দিক থেকে পার্থক্য যথাক্রমে প্রায় ৩০°। আরো লক্ষ করবে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃতি অপেক্ষা উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃতি বেশি।

গুজরাট থেকে অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য দুই (২) ঘণ্টা। যদিও সময় গণনা করা হয় ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমা (৮২°৩০´ পূর্ব) অনুসারে, যা উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের উপর দিয়ে গেছে। এর উপর ভিত্তি করে সমগ্র দেশের প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা হয়। অক্ষরেখাগুলোর বিস্তৃতি দেশের দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে এবং এই বিস্তৃতির ওপর দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

বের করো : * ৮২°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমাকে কেন ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ?
* কন্যাকুমারিকাতে দিন ও রাতের সময়কালের মধ্যে যে পার্থক্য হয়, কাশ্মীরে সেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না কেন ?

ভারত এবং বিশ্ব

পূর্ব এবং পশ্চিম এশিয়ার মধ্যভাগে ভারত ভূখণ্ডটি অবস্থিত। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ সীমান্তে ভারতের অবস্থান। পশ্চিমদিকে ভারত মহাসাগরীয় পথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোর সংগে ভারত সংযোগ রক্ষা করছে। এশিয়ার মধ্যভাগে অবস্থানের ফলে পূর্বদিকের দেশগুলোর সাথেও অবস্থানগত সংযোগ রয়েছে। মনে রাখবে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ভারত মহাসাগর থেকে সৃষ্টি হয়েছে, ফলে ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সঙ্গে এবং পূর্ব উপকূল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। ভারত মহাসাগরসন্নিহিত দেশগুলোর মধ্যে ভারতের মতো দীর্ঘ উপকূলভাগ অন্য কোনো দেশের নেই। ভারতের এই দীর্ঘ উপকূলরেখার জন্য এই মহাসাগরটির

জান কি ? ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল নির্মাণের ফলে ভারতের সাথে ইউরোপের দূরত্ব কমেছে ৭০০০ কিলোমিটার।

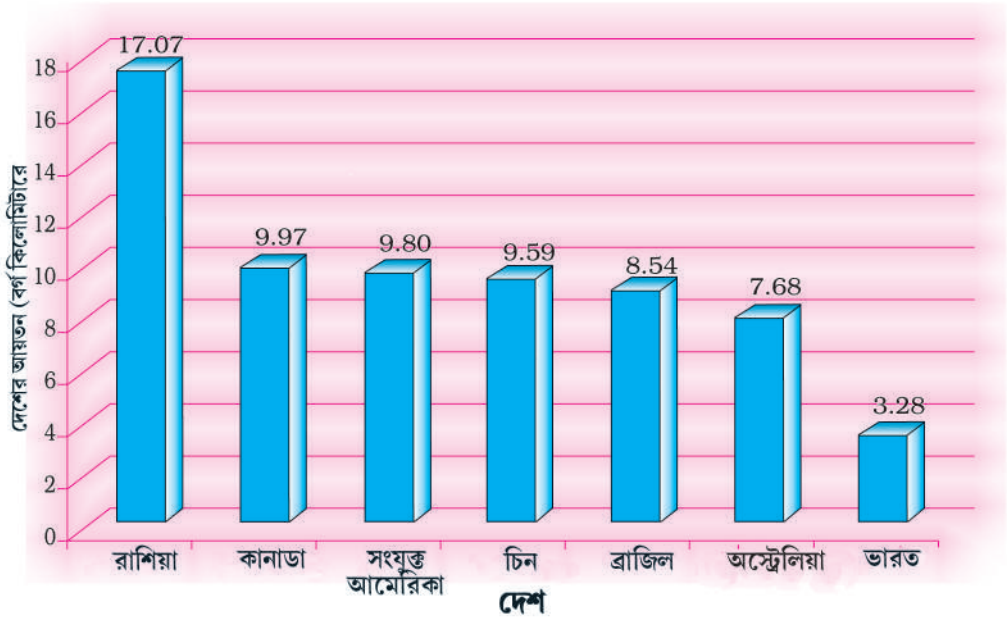

চিত্র ১.২ : পৃথিবীর সাতটি সর্ববৃহৎ দেশসমূহ।
তথ্যসূত্র : যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বিষয়ক বর্ষপঞ্জি

চিত্র ১.৩ : ভারত: বিস্তার ও প্রমাণ দ্রাঘিমা

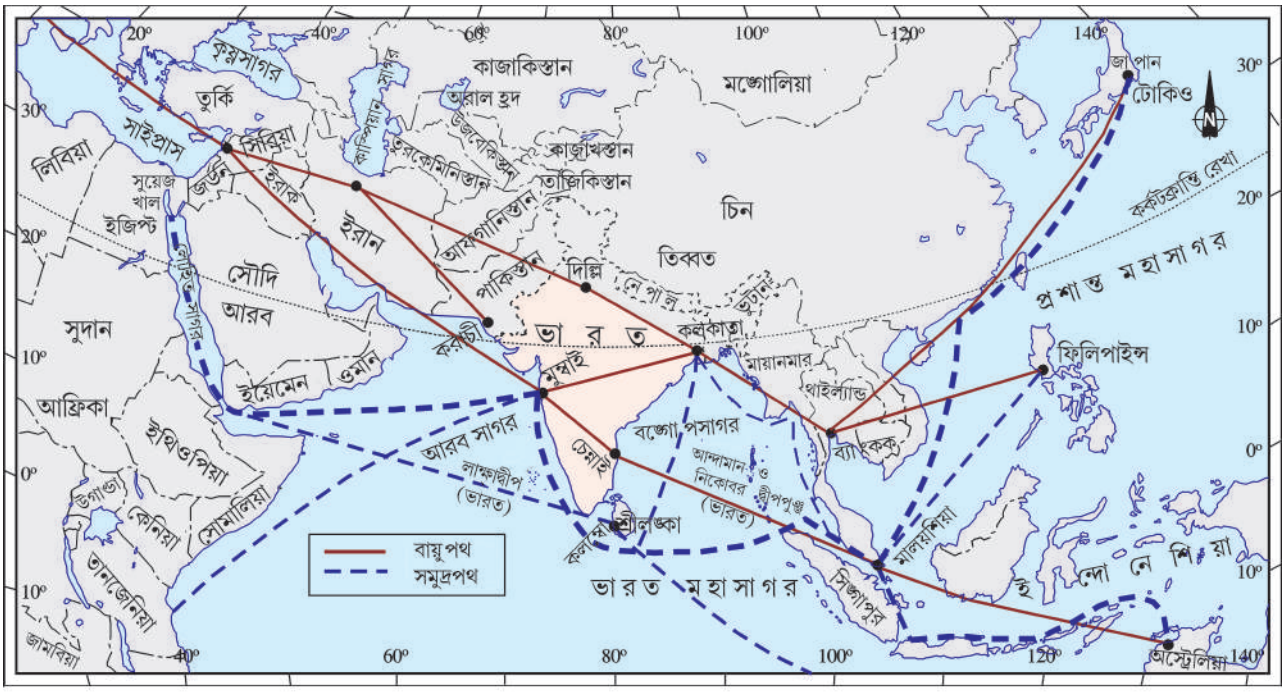

চিত্র ১.৪ : ভারতের আন্তর্জাতিক বানিজ্যপথ।

নাম 'ভারত মহাসাগর' রাখা হয়েছে। রাজা ভরতের নামানুসারে 'ভারত' নাম রাখা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতের যোগাযোগ রয়েছে। যদিও স্থলপথের যোগাযোগ জলপথের যোগাযোগ অপেক্ষা পুরোনো। প্রাচীনকালে পর্যটকরা উত্তরপ্রান্তের বিভিন্ন পর্বতশ্রেণির দুর্গম পথ অতিক্রম করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করত। কারণ তখন সমুদ্র যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা ছিল।

সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের চিন্তাধারা ও বাণিজ্যে এই যোগাযোগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর মাধ্যমে ভারতের গণিত, উপনিষদ, রামায়ণ, পঞ্চতন্ত্রের গল্প প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন মশলাসহ মসলিন কাপড় ও অন্যান্য বহুবিধ সামগ্রীও ভারত থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হত। অপরদিকে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর গ্রিক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশৈলীর প্রভাবও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায়।

ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহ : (India's Neighbours)

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতবর্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ভারতে বর্তমানে ২৯টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ১টি কেন্দ্রীয় রাজধানী অঞ্চল (দিল্লি) রয়েছে (চিত্র ১.৫)।

বের করো : * পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে অবস্থিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের নাম লেখো।
* আয়তন অনুসারে ভারতের কোন্‌টি ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম রাজ্য ?
* যেসকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত নয় বা উপকূলভাগে অবস্থিত নয় সে সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর নাম লেখো।
* রাজ্যগুলোকে এমন চারটি ভাগে ভাগ করো যাদের সাথে নিম্নলিখিত দেশগুলোর সীমান্ত সংযোগ রয়েছে—
অ) পাকিস্তান খ) চিন গ) মায়ানমার ঘ) বাংলাদেশ।

ভারত উত্তর-পশ্চিম দিকে স্থল সীমারেখা দ্বারা পাকিস্তান ও আফগানিস্থান, উত্তরদিকে চিন (তিব্বত), নেপাল ও ভুটান এবং পূর্বদিকে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। আর দক্ষিণদিকের দুটি প্রতিবেশী দেশ হল ভারত মহাসাগরে ভাসমান

জান কি ? ১৯৪৭ সালের আগে ভারতে দু-ধরনের রাজ্য দেখা যেত — প্রদেশ ও রাজন্যশাসিত রাজ্য। প্রদেশের শাসনব্যবস্থা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হত। অপরদিকে রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলো স্থানীয়, বংশপরম্পরায় নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হত।

চিত্র ১.৫ : ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশসমূহ।

দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ। পক্ প্রণালী ও মান্নার উপসাগর দ্বারা শ্রীলঙ্কা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অপরদিকে লাক্ষাদ্বীপের দক্ষিণে রয়েছে ক্ষুদ্রতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র মালদ্বীপ। ভারতের এই ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্কের গুরুত্বও সীমাহীন। এশিয়ার প্রাকৃতিক মানচিত্রটি দেখো এবং সেখানে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটি চিহ্নিত করো।

জান কি ? স্কুলগৃহ (School Bhavan) হল শিক্ষাগ্রহণের প্রধান কেন্দ্র। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ ও তার পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মানচিত্রকেন্দ্রিক শিক্ষাদান করা হয়।

এটা এন সি ই আর টি (NCERT) অনুমোদিত NRSC/ISRO অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান। http://bhavan.nrsc.gov.in/projects/schoolbhavan - এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আরও বিশেষভাবে জানতে পারবে।

অনুশীলনী

১) নীচে প্রদত্ত বিকল্প তথ্যগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

ক) কর্কটক্রান্তিরেখাটি যে রাজ্যের উপর দিয়ে যায়নি, সেটি হল—

অ) রাজস্থান আ) ওড়িশা ই) ছত্তিশগড় ঈ) ত্রিপুরা

খ) ভারতের অন্তিম পূর্বপ্রান্তের দ্রাঘিমা হল—

অ) ৯৭°২৫´ পূ. আ) ৬৮°৭´ পূ. ই) ৭৭°৬´ পূ. ঈ) ৮২°৩২´ পূ.

গ) যে প্রতিবেশী দেশের সাথে উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের স্থলসংযোগ রয়েছে—

অ) চিন আ) ভুটান ই) নেপাল ঈ) মায়ানমার।

ঘ) গ্রীষ্মের ছুটিতে তুমি কাভারাত্তি যাবে ঠিক করেছ, তাহলে ভারতের কোন্ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যাবে—

অ) পুদুচেরি আ) লাক্ষাদ্বীপ ই) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ঈ) দমন ও দিউ।

ঙ) আমার এক বন্ধু এমন একটি দেশ থেকে খ্যাতি লাভ করেছে যার ভারতের সাথে আন্তর্জাতিক সীমানা সংযোগ নেই, দেশটি হল—

অ) ভুটান আ) তাজাকিস্থান ই) বাংলাদেশ ঈ) নেপাল।

২) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

ক) আরবসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জসমূহের নাম লেখো।

খ) ভারত অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর দেশগুলোর নাম লেখো।

গ) ভারতের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের নাম লেখো।

ঘ) ভারতের দক্ষিণদিকে অবস্থিত প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর নাম লেখো।

৩) ভারতের পশ্চিমদিকে অবস্থিত গুজরাট অপেক্ষা পূর্বদিকে অবস্থিত অরুণাচল প্রদেশে দুঘণ্টা আগে সূর্যোদয় হয়, কিন্তু প্রত্যেকের ঘড়িতে একই সময় নির্দেশ করে। এটা কীভাবে সম্ভব ?

৪) ভারত মহাসাগরের কেন্দ্রভাগে ভারতের অবস্থান ভারতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে — কেন ?

মানচিত্র দক্ষতা :

১) মানচিত্র দেখে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চিহ্নিত করো :

ক) আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে ভাসমান ভারতের দ্বীপপুঞ্জসমূহ।

খ) ভারত উপমহাদেশসংলগ্ন দেশসমূহ।

গ) যেসকল রাজ্যের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখাটি প্রবাহিত হয়েছে।

ঘ) সর্বোত্তরের অক্ষাংশগত মান (ডিগ্রিতে)।

ঙ) ভারতের মূল ভূখণ্ডের অন্তিম দক্ষিণের অক্ষাংশগত মান (ডিগ্রিতে)।

চ) ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমের দ্রাঘিমাগত মান (ডিগ্রিতে)।

ছ) তিনটি সমুদ্রে অবস্থিত স্থানসমূহের নাম।

জ) পক্ প্রণালী যা ভারত থেকে শ্রীলঙ্কাকে পৃথক করেছে।

ঝ) ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ।

প্রকল্প/কাজ :

ক) তোমার রাজ্যের অক্ষাংশগত ও দ্রাঘিমাংশগত অবস্থান খুঁজে বের করো।

খ) 'Silk Route' সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করো। সেইসঙ্গে উচ্চ অক্ষাংশের অঞ্চলগুলোতে যোগাযোগের উন্নয়নে নতুন কী পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে ?

ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ
(Physical Features of India)

২

আগের অধ্যায়ে তোমরা জেনেছ যে, ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ এবং তার ভূমিরূপও বৈচিত্র্যময়। তুমি কী ধরনের ভূমিতে বাস কর ? যদি তুমি সমতল ভূমিতে বাস কর তবে সমতলভূমির বিশাল বিস্তৃতি সম্পর্কে জানবে, যদি তুমি পার্বত্যাঞ্চলে বাস কর তাহলে পর্বত ও উপত্যকাসমূহের দুর্গম ভূমিরূপের সাথে পরিচিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর সকল প্রকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, যেমন- পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, মরুভূমি, দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি ভারতে পরিলক্ষিত হয়। তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ যে, ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন এত বৈচিত্র্যময় কীভাবে হল ! এই অধ্যায়ে আমরা ভারতের প্রধান প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ ও তাদের গঠন সম্পর্কে জানব।

আমাদের চারপাশে আমরা বিভিন্ন ধরনের শিলা দেখতে পাই — কিছু শিলা আছে খুবই কঠিন, যেমন মার্বেল, যা তাজমহল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছিল, কিছু শিলা রয়েছে খুবই কোমল, যেমন- সাজিমাটি (Soap Stone) যা দিয়ে সাধারণত সুগন্ধি পাউডার তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ধরনের শিলা থেকে মাটি সৃষ্টি হয় বলে স্থানভেদে মাটির রঙের পরিবর্তন হয়। তুমি কি এই বৈচিত্র্যের কারণ সম্পর্কে জান ? শিলাগঠনের তারতম্যের ওপর এই পরিবর্তন নির্ভরশীল।

বহু ভূতাত্ত্বিক যুগ ধরে ভারতের এই বিশাল ভূমিরূপ গঠিত হয়েছে বলে ভূ-প্রকৃতিতে এর প্রভাব সুস্পষ্ট। এই ভূতাত্ত্বিক গঠন ছাড়াও নানা প্রক্রিয়া যেমন- আবহবিকার, ক্ষয়ীভবন এবং অবক্ষেপণের ফলে নতুন ও পরিবর্তিত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়েছে। গঠিত হয়েছে ভারতের নতুন ভূমিরূপ।

ভূবিদরা বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু তত্ত্বের মাধ্যমে ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ ও তার গঠনপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল "পাত সংস্থান তত্ত্ব" (Plate Tectonic Theory)। এই তত্ত্বঅনুসারে ভূত্বক অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিভাগ সাতটি প্রধান পাত এবং কিছু অপ্রধান পাতের সমন্বয়ে গঠিত (চিত্র ২.২)। পাত বা প্লেটগুলো চলমান। পাতগুলো মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় – এই দুভাগে বিভক্ত।

এই তত্ত্ব অনুসারে সাতটি প্রধান পাত হল— ১) প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত ২) ইউরোপীয় পাত ৩) উত্তর আমেরিকা পাত ৪) দক্ষিণ আমেরিকা পাত ৫) অস্ট্রেলিয়া পাত ৬) আফ্রিকা পাত ৭) অ্যান্টার্কটিকা পাত। ধীরগতি সম্পন্ন পাতগুলো সঞ্চারণের ফলে কখনও চাপের সৃষ্টি হয়, কখনও ধাক্কা লেগে মহাদেশীয় পাত মহাসাগরীয় পাতের অভ্যন্তরে চলে যায় বা পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। ফলস্বরূপ **ভাঁজ, চ্যুতি** এবং **অগ্ন্যুৎপাতের** সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পও সংগঠিত হয়। এই পাতগুলোর শেষ অংশকে পাতসীমান্ত বলে। ভূবিজ্ঞানীরা পাত সঞ্চরণের এই প্রক্রিয়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন (চিত্র ২.১)। যথা—

১) অভিসারী পাতসীমান্ত (Convergent Boundary) ২) প্রতিসারী পাতসীমান্ত (Divergent Boundary) ৩) নিরপেক্ষ

চিত্র ২.১ : *পাত সীমান্ত সমূহ*

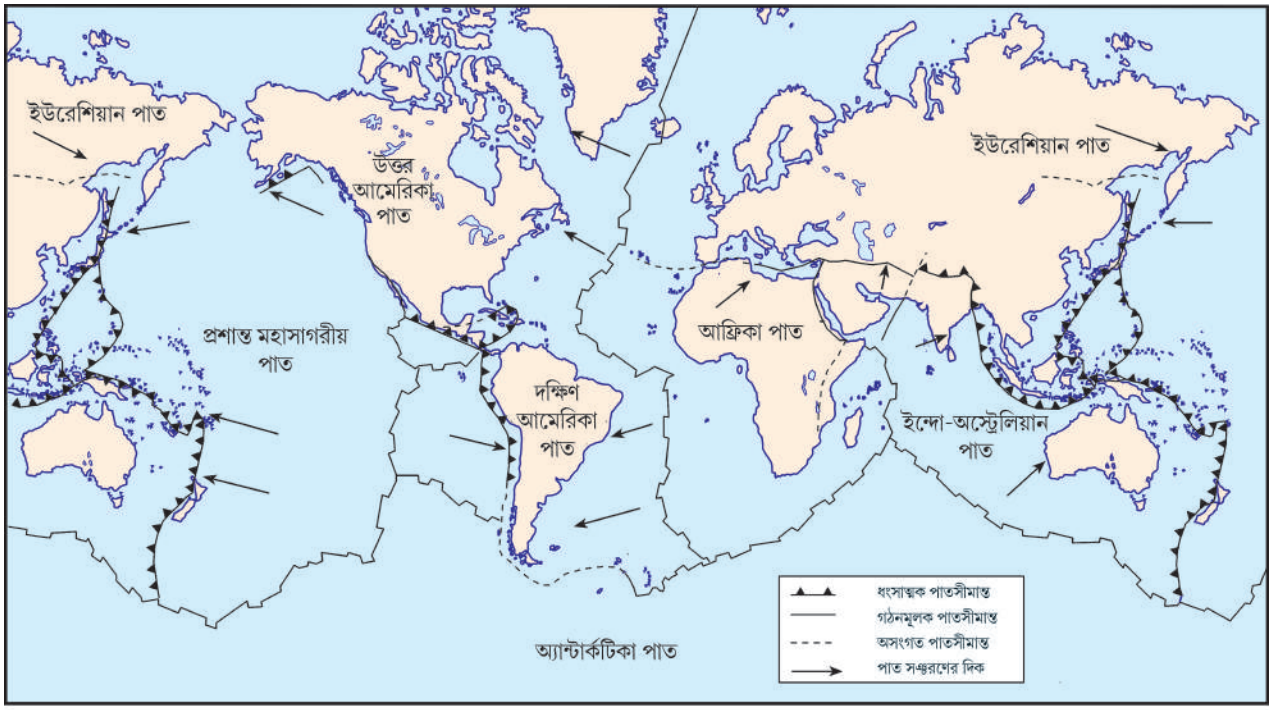

চিত্র ২.২ : পৃথিবী : পাতসীমান্ত

পাতসীমান্ত (Transform Boundary)। বিপরীত দিক থেকে দুই বা ততোধিক পাত যখন পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাকে অভিসারী পাতসীমান্ত বলে।

দুটো পাত যখন স্থানচ্যুত হয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় তখন তাকে প্রতিসারী পাতসীমান্ত বলে। আবার দুটো পাত যখন পরস্পর সংঘর্ষ না করে পাশাপাশি অনুভূমিকভাবে সঞ্চরিত হয় তখন তাকে নিরপেক্ষ পাতসীমান্ত বলে। এক্ষেত্রে দুটো পাত যখন একসঙ্গো পরস্পরের দিকে সঞ্চরিত হয় তখন ধাক্কা লাগতে পারে, টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে বা একটি পাতের নীচে অপর পাতটি চলে যেতে পারে (চিত্র ২.১)। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পাতসমূহের এই সঞ্চরণের ফলে মহাদেশসমূহের অবস্থান ও আকৃতির পরিবর্তন ঘটছে। ভারতের বর্তমান ভূমিরূপ গঠনেও পাত সঞ্চরণের প্রভাব সুস্পষ্ট।

জান কি ? পৃথিবীর অধিকাংশ অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প পাতসীমান্তে হলেও কিছু কিছু অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প পাতের মধ্যভাগেও হয়।

গন্ডোয়ানাল্যান্ড হল পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ড (উপদ্বীপীয় অংশ)। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অ্যান্টার্কটিকা — গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত। পাতসমূহের পরিচলন প্রবাহের ফলে ভাসমান পাতগুলো খণ্ডিত হয়, এর ফলে ইন্দো-অস্ট্রেলীয় পাতটি গন্ডোয়ানাল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তর দিকে সরে গেছে। উত্তরমুখী গমনের ফলে বৃহত্তর ইউরোপীয় পাতের সাথে ধাক্কা খায়। এই ধাক্কার ফলে উভয় পাতের মধ্যবর্তী পাললিক শিলাস্তরে ভাঁজ পড়ে মহীখাত (Geosyncline) অংশে পুঞ্জীভূত হয় এবং পর্বতের সৃষ্টি হয়। যেমন পূর্বের টেথিস সাগর পরিবর্তিত হয়ে পশ্চিম এশিয়ার পর্বতশ্রেণি ও হিমালয় পর্বতে পরিণত হয়েছে।

গন্ডোয়ানাল্যান্ড — প্রাচীন মূল ভূখণ্ড 'প্যাঞ্জিয়া'-র দক্ষিণাংশ গন্ডোয়ানাল্যান্ড এবং উত্তরাংশ আঙ্গারাল্যান্ড নামে পরিচিত।

টেথিস মহীখাতের সঞ্চিত পলিরাশি ভাঁজের আকারে উত্থিত হয়ে হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে এবং উপদ্বীপীয় মালভূমির উত্তর পার্শ্বে বিস্তীর্ণ উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে ক্রমাগত চাপের ফলে টেথিসের উত্তর ও দক্ষিণের আঙ্গারাল্যান্ড ও গন্ডোয়ানাল্যান্ডের ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ টেথিস সাগরের তলদেশে সঞ্চিত হতে থাকে এবং টেথিস সাগরকে ক্রমশ ভরাট করতে থাকে। সঞ্চিত পদার্থসমূহ উত্তরে পর্বত থেকে নদীরূপে বাহিত হয় এবং দক্ষিণে উপদ্বীপীয় অংশে জমা হয়। উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি এই উর্বর পলিমাটি দ্বারা গঠিত।

ভারত একটি বিশাল ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় দেশ। ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুসারে উপদ্বীপীয় মালভূমিটি হল পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রাচীন ভূমিরূপ। ধারণা করা হয় যে, এটি পৃথিবীর একটি সুস্থিত ভূমিরূপ।

অপরদিকে হিমালয় এবং উত্তরের সমভূমি হল নবগঠিত ভূমিরূপ। ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হিমালয় অস্থিতিশীল অঞ্চলে অবস্থিত। হিমালয়ের গঠনপ্রক্রিয়া এখনও চলছে। হিমালয় পর্বতমালা হল একটি নবীন ভঙ্গিল পর্বত। নবগঠিত ভূমিরূপের মধ্যে রয়েছে উচ্চতম শৃঙ্গ, গভীর উপত্যকা, দ্রুতগতিসম্পন্ন নদী প্রভৃতি। উত্তরের বিশাল পলিগঠিত সমভূমিও এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে। উপদ্বীপীয় মালভূমিটি আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। প্রশস্ত উপত্যকা ও নাতি উচ্চ পাহাড় এই ভূমিরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতের প্রধান প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ :
(Major Physiographic Division of India)

ভূ-প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ভারতকে নিম্নলিখিত ছ-টি প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যথা—

১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল;
২) উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চল ;
৩) উপদ্বীপীয় মালভূমি ও উচ্চভূমি ;
৪) ভারতের মরু অঞ্চল ;
৫) উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল ;
৬) দ্বীপপুঞ্জ।

১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল :
(The Himalayan Mountain Region)

হিমালয় হল উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান পর্বতমালা। ভূতাত্ত্বিক বয়সানুযায়ী হিমালয় নবীন ভঙ্গিল পর্বত এটি ভারতের উত্তর সীমান্তে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। (চিত্র ২.৫)। এই পর্বতমালা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রসারিত এবং সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ, বন্ধুর এবং দুর্গম পর্বতশ্রেণি। এর দৈর্ঘ্য ২৪০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হয়, যেমন- কাশ্মীরে ৪০০ কিলোমিটার কিন্তু অরুণাচল প্রদেশে ১৫০ কিলোমিটার। পূর্ব হিমালয় অপেক্ষা পশ্চিম হিমালয়ের উচ্চতা বেশি। স্থানগত উচ্চতার ভিত্তিতে হিমালয়কে সমান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই পাহাড়শ্রেণির মাঝে অসংখ্য উপত্যকা রয়েছে।

১) হিমাদ্রি হিমালয় : সর্বোত্তরের অংশটি প্রধান হিমালয় বা গ্রেট হিমালয় বা হিমাদ্রি নামে পরিচিত। এই অংশে উচ্চতম পর্বতশ্রেণিগুলো সমান্তরালভাবে বিরাজমান, যাদের গড় উচ্চতা ৬০০০ মিটার হলেও স্থানভেদে এই পর্বতশ্রেণি অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গগুলো এই অঞ্চলেই অবস্থিত।

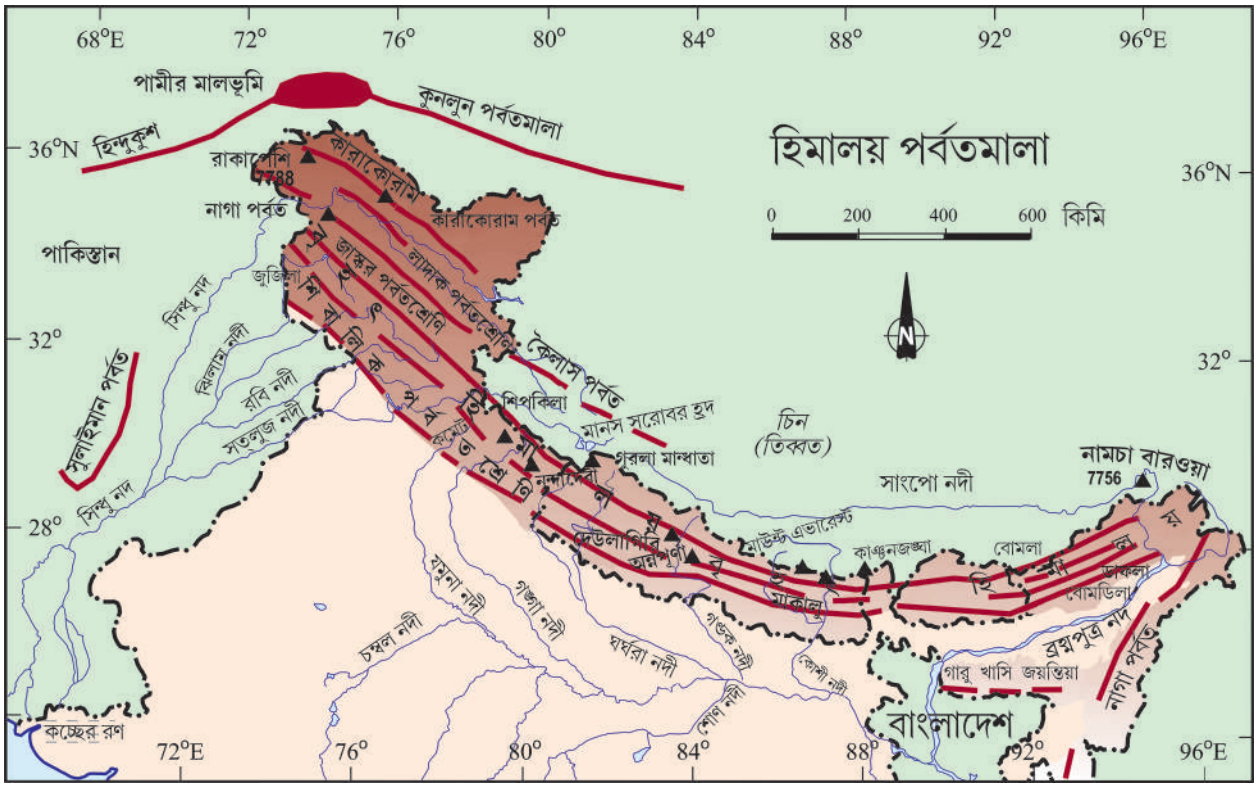

চিত্র ২:৩ : হিমালয় পর্বতমালা

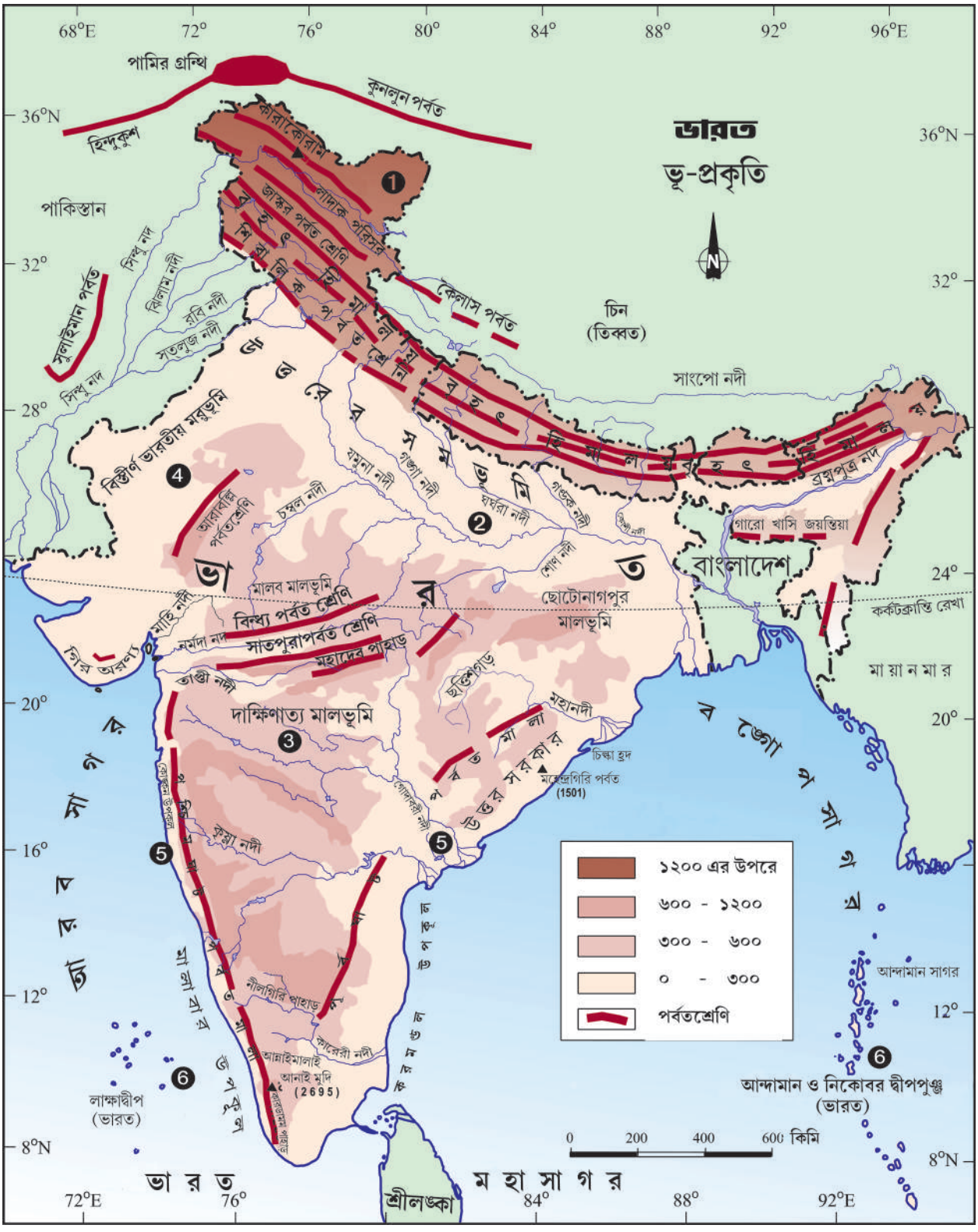

চিত্র ২.৪ : ভারতের ভূ-প্রকৃতি

নিম্নে হিমালয়ের কিছু শৃঙ্গের নাম ও উচ্চতা দেওয়া হল—

শৃঙ্গ	দেশ	উচ্চতা (মি)
মাউন্ট এভারেস্ট	নেপাল	৮৮৪৮
কাঞ্চনজঙ্ঘা	ভারত	৮৫৯৪
মাকালু	নেপাল	৮৪৮১
ধবলগিরি	নেপাল	৮১৭২
নাঙ্গা পর্বত	ভারত	৮১২৬
অন্নপূর্ণা	নেপাল	৮০৭৮
নন্দাদেবী	ভারত	৭৮১৭
কামেট	ভারত	৭৭৫৬
নামচা বারওয়া	ভারত	৭৭৫৬
গুরলা মান্ধাতা	নেপাল	৭৭২৮

প্রধান হিমালয়ের ভাঁজ অসমপ্রকৃতির। মূল হিমালয়ের এই অংশটি গ্রানাইট শিলা দ্বারা গঠিত। পর্বতশিখর বহুবছর ধরে বরফাবৃত, অতিরিক্ত চাপে হিমবাহ রূপে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে।

বের করো :
* প্রধান হিমালয় থেকে যেসকল হিমবাহ নেমে এসেছে তাদের নাম লেখো। হিমাদ্রি হিমালয়ের গিরিপথের নাম লেখো।
* যে সকল রাজ্যে উচ্চতম শৃঙ্গ রয়েছে তাদের নাম লেখো।

২) হিমাচল বা অবহিমালয় :

হিমাদ্রি হিমালয়ের দক্ষিণে দুর্গম পার্বত্য অংশের নাম হিমাচল বা অবহিমালয়। প্রবল ভূ-আলোড়নের ফলে শিবালিক ও হিমাদ্রি হিমালয়ের মধ্যবর্তী অংশে অবহিমালয় গঠিত হয়েছে। অতি প্রাচীন রূপান্তরিত শিলা দ্বারা এই পার্বত্যাঞ্চল গঠিত। এই অংশে ভূমির গড় উচ্চতা ৩৭০০ - ৪৫০০ মিটার এবং গড় বিস্তার ৫০ কিলোমিটার। পিরপাঞ্জাল হল হিমাচল হিমালয়ের দীর্ঘতম এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্বতশ্রেণি। অপর দুটি উল্লেখযোগ্য পর্বতশ্রেণি হল- ধওলাধর এবং মহাভারতলেখ। কাশ্মীরের কাঙড়া উপত্যকা এবং হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকা হল হিমাচল হিমালয়ের দুটি বিখ্যাত উপত্যকা। এই অংশটি মূলত শৈলশহরের জন্য বিশেষ খ্যাত।

বের করো : মানচিত্রে মুসৌরি, নৈনিতাল, রানীক্ষেত প্রভৃতি শৈলশহরের অবস্থান বের করো এবং রাজ্যের নামসহ লেখো।

৩) শিবালিক : হিমালয়ের সর্বদক্ষিণের অংশ শিবালিক নামে পরিচিত। এই অংশের বিস্তৃতি ১০-১৫ কিমি এবং উচ্চতা ৯০০-১১০০ মিটার। উত্তরের হিমাদ্রি হিমালয় থেকে নদীবাহিত পলি দ্বারা শিবালিক বা বহিঃহিমালয় গঠিত। এই উপত্যকা পুরু নুড়ি এবং পলি দ্বারা গঠিত। অবহিমালয় এবং শিবালিক হিমালয়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা 'দুন' নামে পরিচিত। যেমন- দেরাদুন, কোটলিদুন, পাটলি দুন প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত দুন।

চিত্র ২.৫ : হিমালয়

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে হিমালয়কে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— ১) পশ্চিম হিমালয় ২) পূর্ব হিমালয়।

১) পশ্চিম হিমালয় : পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীরের নাঙ্গাপর্বত থেকে পূর্বে নেপালের কালী নদী পর্যন্ত পশ্চিম হিমালয় অবস্থিত। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পশ্চিম হিমালয়ের বিভিন্ন বিভাগগুলো হল—

ক) পাঞ্জাব হিমালয় : সিন্ধু ও শতদ্রু নদীবাহিত পলি দ্বারা পাঞ্জাব হিমালয় গঠিত। এর পূর্ব দিকে রয়েছে কাশ্মীর এবং হিমাচল হিমালয়।

খ) কাশ্মীর হিমালয় : প্রায় সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে এর অবস্থান। কারাকোরাম, লাদাক, জাস্কর, পিরপাঞ্জল এখানকার প্রধান পর্বত। জোজিলা, পিরপাঞ্জল, বানিহাল প্রভৃতি এখানকার প্রধান গিরিপথ। জোজিলার দক্ষিণে রয়েছে হিন্দুতীর্থস্থান অমরনাথ গুহা।

গ) হিমাচল হিমালয় : হিমাচলপ্রদেশের অন্তর্গত এই অংশে রয়েছে ধওলাধর, পিরপাঞ্জাল, নাগটিক্কা, মুসৌরি প্রভৃতি পর্বতশ্রেণি। আছে কাঙড়া উপত্যকা, রোটাং গিরিপথ।

ঘ) কুমায়ুন হিমালয় : পশ্চিম হিমালয়ের এই অংশটি উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত। শতদ্রু ও কালী নদীর মধ্যভাগে কুমায়ুন হিমালয় অবস্থিত। নন্দাদেবী, কামেট, চৌখাম্বা, ত্রিশূল প্রভৃতি এখানকার প্রধান শৃঙ্গ। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী — হিমবাহ দুটি এখানে রয়েছে। এখানকার নিম্ন উপত্যকাগুলো 'দুন' নামে পরিচিত।

২) পূর্ব হিমালয়/পূর্বাচল : কালী ও তিস্তা নদী উপত্যকা নেপাল হিমালয় নামে পরিচিত। তিস্তা ও দিহং নদী উপত্যকা আসাম হিমালয়

চিত্র ২.৬ : মিজো পাহাড়

নামে পরিচিত। সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণি নেপাল ও ভারতকে পৃথক করেছে। এরূপ কিছু আঞ্চলিক বিভাগ খুঁজে বের করো।

পূর্ব হিমালয়ে একেবারে পূর্ব সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদ রয়েছে। হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে দিহং নদী দক্ষিণে কিছুটা বেঁকে পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। পূর্বদিকের এই পাহাড় পর্বতগুলো পূর্বাচল নামে পরিচিত। এই পাহাড়শ্রেণি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতেও প্রসারিত হয়েছে। এই পাহাড়শ্রেণিগুলো শক্ত বালুকাময় পলি দ্বারা গঠিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই পাহাড়শ্রেণিগুলো পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত এবং ঘন অরণ্যাবৃত। পূর্বাচলের প্রধান পর্বত পাটকই, মিশমি, বুম, নাগা, লুসাই, কোহিমা পাহাড়, মিজো পাহাড়, জম্পুইটাং প্রভৃতি নামে অরুণাচল, আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের মধ্য দিয়ে আরও দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে। পূর্বাচলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দাফাবুম (মিশমি পাহাড়)।

চিত্র ২.৭ : উত্তর ভারতের সমভূমি

২) উত্তরের বিশাল সমভূমি (The Northern Plain) :

উত্তরের বিশাল সমভূমি প্রধানত তিনটি প্রধান নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। নদীগুলো হল — সিন্ধু. গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের উপনদীসমূহ। এই সমভূমি উর্বর পলিসমৃদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হিমালয়ের পাদদেশে নদীবাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে এই উর্বর সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। বিশাল এই সমভূমির আয়তন ৭(সাত) লক্ষ বর্গ কিমি।

জান কি ? ব্রহ্মপুত্র নদের মাজুলি দ্বীপ হলো পৃথিবীর বৃহত্তম নদীদ্বীপ।

উত্তর ভারতের এই সমভূমিটি পূর্ব পশ্চিমে ২৪০০ কিমি দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে ২৪০-৩২০ কিমি প্রশস্ত। উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত জল ও জীবনধারণের সুযোগ বেশি থাকায় এখানে ঘন জনবসতি দেখা যায়। এই সমভূমি পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল সমভূমি। উর্বর মাটি, পরিমিত জল ও উপযুক্ত জলবায়ু থাকার ফলে এই সমভূমি ভারতের প্রধান কৃষিজ ফসল উৎপাদক অঞ্চল।

উত্তরের পার্বত্যাঞ্চল থেকে আগত নদীগুলো পলি সঞ্চয় করে। নিম্নগতিতে নদীর ঢাল কমে যাওয়ায় নদী ধীরগতি সম্পন্ন হয়ে পরে, তাই পলি সঞ্চিত হয়ে মোহনায় নদীদ্বীপের সৃষ্টি হয়। নিম্নগতিতে নদীর সঞ্চয়কাজের ফলে মূল নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়। এদের শাখানদী বলে।

উত্তরের বিশাল সমভূমি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা—

১) পাঞ্জাব সমভূমি ২) গাঙ্গেয় সমভূমি ৩) ব্রহ্মপুত্র সমভূমি।

১) পাঞ্জাব সমভূমি : উত্তরের বিশাল সমভূমির পশ্চিমাংশ পাঞ্জাব সমভূমি নামে পরিচিত। সিন্ধু ও তার উপনদীর পলি সঞ্চিত হয়ে এই সমভূমি গঠিত হয়েছে। এই সমভূমির বৃহৎ অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধু ও তার উপনদী (শতদ্রু, বিপাশা, ঝিলাম, চেনাব, রবি) গুলো হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদী মধ্যবর্তী সমভূমি 'দোয়াব' নামে পরিচিত।

জান কি ? 'দোয়াব' কথাটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'দো' শব্দের অর্থ দুই এবং 'আব' শব্দের অর্থ জল, 'পাঞ্জাব' শব্দটিও একই ভাবে দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'পঞ্চ' অর্থ পাঁচ আর 'আব' অর্থ জল, অর্থাৎ পাঁচটি নদীবিধৌত সমভূমি দ্বারা পাঞ্জাব রাজ্যটি গঠিত।

২) গাঙ্গেয় সমভূমি : গঙ্গার উপনদী যমুনা থেকে তিস্তা নদীবিধৌত পলিদ্বারা গাঙ্গেয় সমভূমি গঠিত। উত্তর ভারতের হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ডের কিয়দংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ এই সমভূমির অন্তর্গত। এর আয়তন প্রায় ৩,৫৭,০০০ বর্গ কিমি। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে একে অ) উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি, আ) মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি এবং ই) নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি — এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

৩) ব্রহ্মপুত্র সমভূমি : আসাম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার উপনদীগুলির পলি দ্বারা ব্রহ্মপুত্র সমভূমি গঠিত।

উত্তরের সমভূমি বলতে সাধারণত সমতল ভূমি হিসেবে বর্ণনা করা হলেও এটা ঠিক নয়, এই বিশাল সমভূমিও বৈচিত্র্যময়, নানা ধরনের ভূমিরূপ এখানে দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যের জন্য উত্তরের

সমভূমিকে চারটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ক) গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরাংশে অর্থাৎ হিমালয় পর্বতের পাদদেশে প্রায় ৮ থেকে ১৬ কিমি প্রস্থ বিশিষ্ট সংকীর্ণ ও ঢালু অংশকে **ভাবর** অঞ্চল বলে। মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতার জন্য হিমালয় থেকে আগত ছোটো নদীগুলো এই ভাবর অংশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

খ) ভাবরের দক্ষিণ প্রান্তে নদীগুলো পুনরায় ভূপৃষ্ঠে আসে এবং স্যাঁতস্যাতে জলাভূমির সৃষ্টি হয়, যা **'তরাই'** নামে পরিচিত। পূর্বভাগ ঘন অরণ্যে ঘেরা এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। এই অরণ্য **'ডুয়ার্স'** নামে পরিচিত। এই বনভূমি পরিষ্কার করে কৃষিজমি তৈরি করা হয়েছে এবং দেশ ভাগের পর পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীরা এখানে বসবাস শুরু করেছে। এই অঞ্চলের **'দুধওয়া জাতীয় উদ্যান'** (Dudhwa National Park) টি খুঁজে বের করো।

গ) উত্তরের সমভূমির বিশাল অংশ প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত। বন্যার ফলে নদীবাহিত পলি জমতে জমতে ভূমির উচ্চতা বেড়ে যায়, তখন সেখানে আর পলি জমতে পারে না। এরূপ ভূমিরূপকে **ভাঙ্গার** বলে। ভাঙ্গার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চুনযুক্ত হলে তখন তাকে **কংকর** বলে।

ঘ) গাঙ্গেয় অববাহিকায় বন্যার ফলে নদীবাহিত নবীন পলি দ্বারা যে ভূমিরূপ গঠিত হয় তাকে **'খাদর'** বলে। প্রতি বছর বন্যায় প্লাবিত হয় বলে এই মাটি খুবই উর্বর এবং কৃষির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।

২) উপদ্বীপীয় মালভূমি (The Peninsular Plateau) :

উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চলটি প্রায় সমতল পৃষ্ঠবিশিষ্ট এবং প্রাচীন স্ফটিকাকার আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে গন্ডোয়ানাল্যান্ড ভেঙে ও সঞ্চরিত হয়ে প্রাচীন এই ভূখণ্ডটি গঠিত হয়েছে। এই মালভূমিটি উত্তরে প্রশস্ত এবং দক্ষিণদিকে ক্রমশ সংকীর্ণ উপত্যকা ও পর্বতদ্বারা বেষ্টিত, এই উপদ্বীপীয় মালভূমি দুটি প্রধানভাগে বিভক্ত। যথা— ক) মধ্যভাগের উচ্চভূমি এবং খ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি।

ক) মধ্যভাগের উচ্চভূমি : নর্মদা নদীর উত্তরাংশ থেকে মালব মালভূমি পর্যন্ত অংশটি মধ্যভাগের মালভূমি নামে পরিচিত। উত্তর

চিত্র ২.৮ : ছোটনাগপুর মালভূমির একটি ঝরনা।

পশ্চিম দিকে আরাবল্লি পর্বত থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত এই উচ্চভূমি বিস্তৃত। পশ্চিমদিকে মধ্যভারতের এই উচ্চভূমি ক্রমশ প্রস্তর ও বালুকাময় রাজস্থানের সাথে মিশে গেছে। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদীগুলো হল চম্বল, সিন্ধ, বেতোয়া প্রভৃতি। ভূমির ঢাল অনুসারে নদীগুলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তরপূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। মধ্যভাগের উচ্চভূমি পশ্চিম দিকে প্রশস্ত হলেও পূর্বদিকে সংকীর্ণ। বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ড নামে পূর্বদিকে প্রসারিত হয়েছে। মালওয়া মালভূমির উত্তর পূর্বাংশ এবং যমুনা নদীর দক্ষিণে গ্রানাইট ও নিস্ শিলা দ্বারা বুন্দেলখণ্ড মালভূমি গঠিত। অপরদিকে শোণ্ নদীর দক্ষিণে পাললিক ও গ্রানাইট শিলা দ্বারা বাঘেলখণ্ড মালভূমি গঠিত।

মধ্যভাগের উচ্চভূমি আরও পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে ছোটোনাগপুর মালভূমি নামে পরিচিত। এই মালভূমির অধিকাংশ স্থান আর্কিয়ান যুগের গ্রানাইট ও নিস্ শিলা দ্বারা গঠিত। দামোদর নদ এই মালভূমির মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। হাজারিবাগ মালভূমিতে অবস্থিত পরেশনাথ পাহাড় (১৩৬৬ মি) ছোটোনাগপুর মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। হুড্রু, জোনা, দশমফলস্ প্রভৃতি এই মালভূমির প্রধান জলপ্রপাত (চিত্র ২.৮)।

খ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি : নর্মদা নদীর দক্ষিণে ত্রিভুজাকৃতি ভূখণ্ডটি হল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, এর উত্তর সীমান্তে রয়েছে সাতপুরা পর্বতশ্রেণি এবং পূর্ব সীমান্তে রয়েছে মহাদেব, কাইমুর, মহাকাল প্রভৃতি পর্বত সমূহ। ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রে এই সকল পাহাড় ও পাহাড়শ্রেণি চিহ্নিত করো। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমশ কমেছে। এই মালভূমির প্রসার ভারতের উত্তর-পূর্বদিকেও দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে এগুলো মেঘালয় মালভূমি, কার্বিয়াংলঙ মালভূমি, উত্তর কাছাড় পাহাড় নামে পরিচিত। চ্যুতির মাধ্যমে এটি ছোটোনাগপুর মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন, পশ্চিম থেকে পূর্বে এই মালভূমির প্রধান তিনটি পাহাড় হল — গারো পাহাড়, খাসি পাহাড়, জয়ন্তিয়া পাহাড়।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পশ্চিমদিকে রয়েছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বা সহাদ্রি এবং পূর্বদিকে রয়েছে পূর্বঘাট পর্বত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে রয়েছে। এই পর্বতশ্রেণি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের ফলে একমাত্র গিরিপথের মাধ্যমেই অতিক্রম করতে হয়, যেমন- থলঘাট, ভোরঘাট, পালঘাট প্রভৃতি। ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রে এই সকল গিরিপথের অবস্থান খুঁজে বের করো।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উচ্চতা পূর্বঘাট পর্বতমালা অপেক্ষা অধিক। এর গড় উচ্চতা ৯০০-১৬০০ মিটার, অপরদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালার গড় উচ্চতা ৬০০ মিটার।

পূর্বঘাট পর্বতমালা উত্তরে মহানদী উপত্যকা থেকে দক্ষিণে

নীলগিরি পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বঘাট পর্বতমালা অসংযুক্ত, অনিয়মিত এবং বঙ্গোপসাগরগামী পূর্ববাহিনী নদী দ্বারা বিছিন্ন। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রতিহত করে। এর ফলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম পার্শ্বে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটে। পশ্চিমঘাট পর্বতের স্থানীয় নাম সহাদ্রি। উত্তর থেকে দক্ষিণে এই পর্বতমালার উচ্চতা ক্রমশ বেড়েছে। পশ্চিমঘাট পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কলসুবাই (১৬৪৬ মি)। পূর্বঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মহেন্দ্রগিরি (১৫০১ মি)। এছাড়া রয়েছে দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আন্নামালাই পর্বতের আনাইমুদি (২৬৯৫ মি), নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দোদাবেত্তা (২৬৩৭ মি) পূর্বঘাট পর্বতমালার দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে সেভরয় পাহাড় এবং জাভাদি পাহাড়। বিখ্যাত শৈলশহর উদাগামন্ডলম, যা উটি নামে পরিচিত, অপর শৈলশহর কুদাইকানাল।

চিত্র ২.৯ : ভারতীয় মরুভূমি

উপদ্বীপীয় মালভূমির একটি বৈশিষ্ট্যময় ভূমিরূপ হল কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল যা ডেকান ট্র্যাপ (Deccan Trap), 'ডেকান' অর্থ দাক্ষিণাত্য এবং 'ট্র্যাপ' অর্থ ধাপ বা সিঁড়ি। এটি অগ্ন্যুৎপাত জনিত আগ্নেয় শিলা - ব্যাসল্ট দ্বারা গঠিত। দীর্ঘ সময় ধরে অববাহিকার ক্ষয়ীভবন এবং নগ্নীভবনের ফলে কৃষ্ণমৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে। উপদ্বীপীয় মালভূমির পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত আরাবল্লি অবস্থিত। এই পর্বত দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে বলে, একে ক্ষয়জাত পাহড়ের মতো দেখায়। আরাবল্লি পর্বত দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে গুজরাট থেকে দিল্লির দিকে প্রসারিত।

৩) ভারতের মরুভূমি অঞ্চল (The Indian Desert) :

রাজস্থানে আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে ভারতের মরুঅঞ্চল 'থর' অবস্থিত, এটি তরঙ্গায়িত, বালুকাময় পাথুরে মাটি এবং বালিয়াড়ি দ্বারা গঠিত। এই মরু অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০ মিলিমিটারের কম। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক, স্বাভাবিক উদ্ভিদ নেই বললেই চলে। বর্ষাকালেই একমাত্র জলপ্রবাহ দেখা যায়। তবে সমুদ্রের দিকে

চিত্র ২.১০ : উপকূলীয় সমভূমি

প্রবাহিত হওয়ার মতো জলধারা না থাকায় এগুলো অচিরেই বালিতে পরিণত হয়। লুনি নদী এই মরু অঞ্চলের একমাত্র নদী (চিত্র. ২.৯)। মরুঅঞ্চলের ব্যাপক অংশে বার্খান (অর্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়ি) অবস্থিত, তবে ভারত - পাকিস্তান সীমান্তে অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি বিশেষভাবে সুস্পষ্ট। যদি তুমি জয়সলমির যাও, তাহলে এই ধরনের বার্খান দেখতে পাবে।

৪) উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল (The Costal Plains) :

উপদ্বীপীয় মালভূমির পশ্চিমপার্শ্বে আরবসাগর এবং পূর্বপার্শ্বে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন অংশে সংকীর্ণ উপকূলীয় সমভূমি অবস্থিত (চিত্র. ২.১০)। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং আরবসাগরের মাঝখানে সংকীর্ণ পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলটি অবস্থিত। পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমিটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। সর্বোত্তরের অংশ কোঙ্কন উপকূল (মুম্বাই থেকে গোয়া) মধ্যভাগে প্রসারিত অংশ কন্নড় উপকূল (কর্ণাটক) এবং সর্ব দক্ষিণের অংশ মালাবার উপকূল (কর্ণাটক, কেরালা) নামে পরিচিত।

পূর্ব বা বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল প্রশস্ত ও সমতল, পূর্ব উপকূল দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। উত্তরের অংশ উত্তর সরকার উপকূল এবং দক্ষিণের অংশ করমণ্ডল উপকূল নামে পরিচিত। মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি দীর্ঘ নদীসমূহ পূর্ব উপকূলে বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ গঠন করেছে। পূর্ব উপকূলের একটি বৈশিষ্ট্য হল চিল্কা হ্রদের অবস্থান।

চিত্র ২.১১ : একটি দ্বীপ

জান কি ? চিল্কা ভারতের বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হ্রদ। চিল্কা হ্রদটি ওড়িশা রাজ্যের প্রধান নদী মহানদীর ব-দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত। একে উপহ্রদও বলা হয়।

৫) দ্বীপসমূহ (The Islands) : তুমি ভারতের মূল ভূখণ্ডের বিশাল আকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে জেনেছ। এগুলো ছাড়াও ভারতের দুটো দ্বীপ অঞ্চল রয়েছে। তুমি কি এই দ্বীপ অঞ্চলসমূহকে খুঁজে বের করতে পারবে ?

ক) লাক্ষাদ্বীপ পুঞ্জ : আরবসাগরে কেরালার মালাবার উপকূল সন্নিহিত স্থানে লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জটি অবস্থিত, এটি একটি প্রবাল দ্বীপ পুঞ্জ। যুগ যুগ ধরে মৃত প্রবালকীটের দেহ থেকে চুনজাতীয় পদার্থ নির্গত হয়ে এই দ্বীপসমূহ গঠিত হয়েছে। ৩৬টি ছোটো দ্বীপ মিলিত হয়ে এই দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত হয়েছে। পূর্বে এটি **লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি** — এই তিনটি নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭৩ সাল থেকে এগুলোকে একত্রে **লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ** নামে অভিহিত করা হয়। লাক্ষাদ্বীপের আয়তন ৩২ বর্গ কিমি। এটি ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কাভারাত্তি হল লাক্ষাদ্বীপের রাজধানী ও প্রশাসনিক শহর। এই দ্বীপপুঞ্জে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত রয়েছে। এখানকার জনমানবহীন **পিট্টি দ্বীপপুঞ্জ** পাখিদের আবাসস্থল (চিত্র ২.১১)।

প্রবাল (Corals)

জেনে নাও : কোরাল পলিপস (Coral Polyps) নামক একটি ক্ষণজীবী আণুবীক্ষণিক কীটের মৃত দেহাবশেষ দ্বারা প্রবাল প্রাচীর গঠিত। এই কীটসমূহ অগভীর, পলিমুক্ত এবং উষ্ণ জলে বাস করে। এদের দেহে ক্যালশিয়াম কার্বনেট থাকে। প্রবালকীটের দেহ থেকে আঠালো পদার্থ নির্গত হয়। এদের দেহাবশেষ সঞ্চিত হয়ে প্রবালপ্রাচীর গঠিত হয়। মূলত তিন ধরনের প্রবাল প্রাচীর দেখা যায়। যথা- প্রতিবন্ধক প্রবালপ্রাচীর, প্রান্ত প্রবাল প্রাচীর এবং প্রবাল বলয়। অস্ট্রেলিয়ার 'Great Barrier reaf' হল প্রতিবন্ধক প্রবালপ্রাচীর-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, প্রবাল বলয় গোলাকৃতি বা অশ্বক্ষুরাকৃতি হয়। এই বলয়টি পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল বলয়।

খ) বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ : এখন তোমরা বঙ্গোপসাগরে উত্তর থেকে দক্ষিণে মালার মতো সম্প্রসারিত দ্বীপসমূহকে দেখো। এই দ্বীপসমূহ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত। এই দ্বীপপুঞ্জ আয়তনে বৃহৎ, সংখ্যায় অধিক ও বিক্ষিপ্ত। এই দ্বীপসমূহ দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা- উত্তরে ছোটোবড়ো ২০৪টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণে ১৯টি দ্বীপ নিয়ে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। সমুদ্রগর্ভস্থ পর্বত উত্থিত হয়ে এই দ্বীপসমূহ গঠিত হয়েছে। এই দ্বীপসমূহের অবস্থান আমাদের দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এখানেও উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে বিশাল বৈচিত্র্য রয়েছে। এই দ্বীপপুঞ্জ নিরক্ষরেখার খুব নিকটে অবস্থিত হওয়ায় নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গভীর অরণ্যাবৃত।

জান কি ? আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভারতের একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ব্যারেন অবস্থিত।

প্রত্যেকটি অঞ্চলের বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে অঞ্চলসমূহকে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রদান করেছে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটা অঞ্চল একে অপরের পরিপূরক এবং ভারতকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে। পর্বত হল জলের প্রধান উৎস এবং বনজ সম্পদের জন্য পার্বত্যভূমির অবদান উল্লেখযোগ্য। উত্তরের সমভূমিতে রয়েছে সমগ্র দেশের শস্যভাণ্ডার। প্রাচীন সভ্যতার উৎসভূমি হল এই সমভূমি। মালভূমি অঞ্চল হল ভারতের খনিজ ভান্ডার। এই খনিজ সম্পদ দেশের শিল্পোন্নতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় অঞ্চল এবং দ্বীপপুঞ্জসমূহ মৎসচাষ ও বন্দর গড়ে তুলতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ভারতকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের অগ্রগতির সম্ভাবনা সুস্পষ্ট।

অনুশীলনী

১) নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

ক) তিন দিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত স্থলভাগকে বলে —
অ) উপকূল আ) উপদ্বীপ ই) দ্বীপ ঈ) কোনোটিই নয়।

খ) ভারতের পূর্বপ্রান্তে মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত পর্বতশ্রেণি হল —
অ) হিমাচল আ) পূর্বাচল ই) উত্তরাখণ্ড ঈ) কোনোটিই নয়।

গ) গোয়ার দক্ষিণ অংশে পশ্চিম উপকূলের নাম —
অ) করমণ্ডল আ) কোঙ্কন ই) কন্নড় ঈ) উত্তর সরকার।

ঘ) পূর্বঘাট পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল —
অ) আনাইমুদি আ) কাঞ্চনজঙ্ঘা ই) মহেন্দ্রগিরি ঈ) খাসি।

২) নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

ক) সঞ্চরণশীল পাত (Tectonic Plates) কী ?

খ) বর্তমানে কোন্ মহাদেশ গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের অংশ ?

গ) ভাবর কী ?

ঘ) উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমালয়ের প্রধান তিনটি ভাগের নাম লেখো।

ঙ) আরাবল্লি পর্বত ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত মালভূমিটির নাম কী ?

চ) ভারতের প্রবালগঠিত দ্বীপপুঞ্জের নাম লেখো।

৩) পার্থক্য — ক) অভিসারী পাত ও প্রতিসারী পাত (Converging & Diverging Techtonic Plates)

খ) ভাঙ্গার এবং খাদর।

গ) পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালা।

৪) হিমালয়ের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

৫) ভারতের প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগগুলোর নাম লেখো। হিমালয় পার্বত্যাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে উপদ্বীপীয় মালভূমির ভূ-প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করো।

৬) উত্তর ভারতের সমভূমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭) টিকা লেখো — অ) ভারতের মরুঅঞ্চল

আ) মধ্যভাগের উচ্চভূমি

ই) ভারতের দ্বীপপুঞ্জসমূহ

মানচিত্র দক্ষতা -

ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দেখাও —

ক) পাহাড় ও পর্বতশ্রেণি — কারাকোরাম, জাস্কর, পাটকই, জয়ন্তিয়া, বিন্ধ্য পর্বতমালা, আরাবল্লি পর্বত, কার্ডামম পাহাড়।

খ) পর্বতশৃঙ্গ — গডউইন অস্টিন বা K_2, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নাঙ্গা পর্বত, আনাইমুদি।

গ) মালভূমি — ছোটোনাগপুর, মালওয়া।

ঘ) ভারতের মরুভূমি, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ।

প্রকল্প/কাজ -

শব্দছকে নিহিতি পর্বতশৃঙ্গ, গিরিপথ, পর্বতশ্রেণি, মালভূমি, পাহাড় ও দুন প্রভৃতি স্থানগুলো চিহ্নিত করো। এধরনের ভূমিরূপ কোথায় আছে খুঁজে বের করো। অনুভূমিক (পাশাপাশি), উল্লম্ব (উপর-নীচ), কৌণিক ☒ যে-কোনো -ভাবেই খুঁজতে পারো।

E	M	K	U	N	L	N	A	T	H	U	L	A	R	I	A	H	I	A	T
M	H	A	S	J	M	A	N	J	K	M	A	J	L	B	H	O	R	P	J
J	N	V	F	A	E	T	D	C	A	R	D	E	M	O	M	L	O	M	K
C	R	E	I	I	Q	H	M	O	I	F	T	N	X	M	A	X	F	C	T
N	M	T	S	N	A	U	Q	R	M	S	A	N	A	D	I	D	A	N	J
A	B	X	A	T	G	A	R	O	U	L	F	V	D	I	K	P	T	D	C
C	Y	C	H	I	G	A	M	M	R	D	T	I	Z	L	A	J	P	O	K
H	R	T	K	A	N	C	H	E	N	J	U	N	G	A	L	U	L	B	E
O	O	M	O	P	I	T	P	N	O	S	S	D	D	K	S	P	D	O	K
T	D	A	N	M	L	M	D	D	C	S	A	H	L	S	A	I	E	E	J
A	R	R	K	A	G	T	H	A	R	H	E	Y	D	H	H	A	I	A	R
N	S	A	A	L	I	A	T	L	E	I	Y	A	B	A	Y	T	H	R	L
A	Z	V	N	W	R	E	D	S	P	P	A	N	H	D	A	O	J	U	K
G	O	A	N	A	I	M	U	D	I	K	D	P	M	W	D	A	B	P	E
P	A	L	L	J	S	H	E	V	R	I	Y	E	V	E	R	E	S	T	M
U	O	I	M	Y	R	Y	P	A	T	L	I	G	J	E	I	T	H	A	R
R	K	I	Q	S	L	A	H	C	N	A	V	R	V	P	E	A	T	S	P

৩

জলনিকাশি ব্যবস্থা (নদনদী)
(Drainage)

নিকাশি বা জল নির্গমন বলতে কোনো এলাকার নদনদীর প্রবাহকে বোঝায়। ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্র দেখলে দেখবে, ছোটো বড়ো বিভিন্ন জলপ্রবাহ বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এক সাথে মিলিত হয়। এই নদী, শাখা ও উপনদীর সাথে মিশে মূল নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে হ্রদ, সাগর বা মহাসাগরে পতিত হয়।

ভূপৃষ্ঠের যে অঞ্চল দিয়ে কোনো একটি নদীর জল প্রবাহিত হয় তাকে ওই নদীর অববাহিকা বলে, যেমন- গঙ্গা নদীর অববাহিকা। সূক্ষ্মভাবে মানচিত্রের দিকে তাকাও, দেখবে যে, অসমতল পৃষ্ঠ যেমন পাহাড় বা উচ্চভূমি দ্বারা দুটো নদীর উপত্যকা পৃথক হয়ে যায়। এই পাহাড় বা উচ্চভূমিকে **জল বিভাজিকা** বলে (চিত্র ৩.১)।

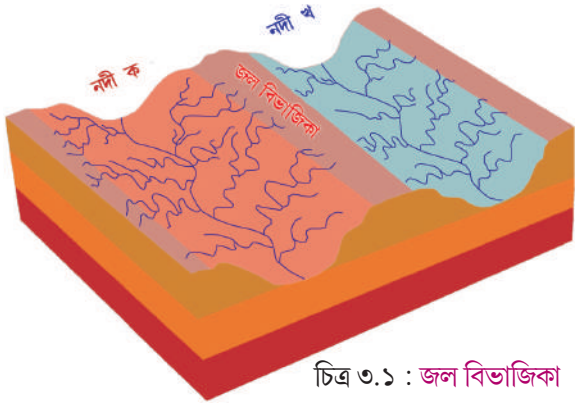

চিত্র ৩.১ : জল বিভাজিকা

জান কি ? আমাজন নদের অববাহিকা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা।

বের করো : ভারতের বৃহত্তম নদী অববাহিকার নাম কী ?

ভারতের জলনির্গমন প্রণালীসমূহ :
(Drainage System in India)

ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ প্রকৃতিই এই দেশের নদনদীর প্রধান নিয়ন্ত্রক। এই কারণে ভারতের নদনদীগুলি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত।

১) হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদনদীসমূহ।
২) দাক্ষিণাত্য মালভূমি থেকে উৎপন্ন নদনদীসমূহ।

এছাড়া এই দুই প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চল- ক) হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদনদী, খ) উপদ্বীপীয় মালভূমি থেকে উৎপন্ন নদনদী- এরূপ দু-ভাগে বিভক্ত এবং নদনদীগুলো বিভিন্নভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।

হিমালয় থেকে উৎপন্ন বেশির ভাগ নদীতে সারাবছর ধরে জল প্রবাহিত হয়। এই নদীগুলি উঁচু পর্বতের বরফগলা জল এবং বৃষ্টির জল দ্বারা পরিপুষ্ট থাকে।

হিমালয় থেকে উৎপন্ন দুটি প্রধান নদী হল সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র নদ যা উত্তরের পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন। এগুলি পর্বতকে বিভাজিত করে সংকীর্ণ গিরিখাত সৃষ্টি করেছে (চিত্র ৩.২)। হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলি অনেক দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। উচ্চগতিতে ব্যাপক ক্ষয়কার্য দ্বারা প্রচুর বালি ও পলি বহন করে আনে। মধ্যগতি ও নিম্নগতিতে নদী আঁকাবাঁকা পথে চলার ফলে মিয়েন্ডার, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি করে এবং পলি সঞ্চয়ের ফলে সমতলে বন্যা সৃষ্টি করে। এছাড়া মোহনায় এগুলি ব-দ্বীপও গঠন করে।

চিত্র ৩.২ : গিরিখাত

জলনির্গমন প্রণালী

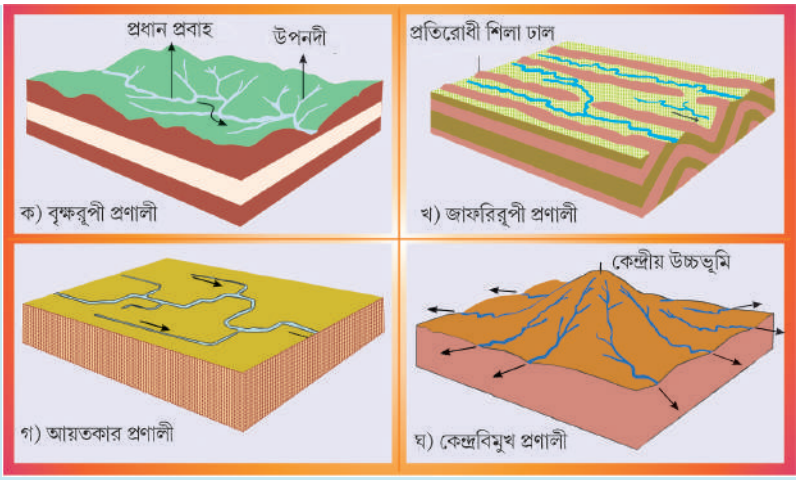

কোনো অঞ্চলের ভূমির ঢাল, শিলার গঠন ও জলবায়ুর উপর জলনির্গমন প্রণালী নির্ভর করে। জলনির্গমন প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের হয় : যেমন ১) বৃক্ষরূপী জলনির্গমন প্রণালী ২) জাফরিরূপী জলনির্গমন প্রণালী ৩) আয়তাকার জলনির্গমন প্রণালী ৪) কেন্দ্রবিমুখ জল নির্গমন প্রণালী প্রভৃতি।

১) বৃক্ষরূপী জল নির্গমন প্রণালী : প্রধান নদী ও তার উপনদীগুলি মিলিতভাবে একটি বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন তাকে বৃক্ষরূপী জলনির্গমন প্রণালী বলে। ২) জাফরিরূপী জলনির্গমন প্রণালী : প্রধান নদীর সঙ্গে উপনদীগুলি প্রায় সমকোণে মিলিত হয়ে যে জলনির্গমন প্রণালী সৃষ্টি করে তাকে জাফরিরূপী জলনির্গমন প্রণালী বলে। যেখানে কঠিন ও কোমল শিলা পাশাপাশি থাকে সেখানে এরূপ জলনির্গমন প্রণালী দেখা যায়। ৩) আয়তাকার জলনির্গমন প্রণালী : এই জলনির্গমন প্রণালী দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ শিলাগঠিত অঞ্চলে দেখা যায়। ৪) কেন্দ্রবিমুখ জলনির্গমন প্রণালী : কোনো উচ্চভূমি, পাহাড় ও পর্বতের কোনো উঁচু স্থান থেকে নদী বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হলে তাকে কেন্দ্রবিমুখ জলনির্গমন বলে। এই জলনির্গমন প্রণালীতে মধ্যভাগে শৃঙ্গ বা ডোম আকৃতির ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়।

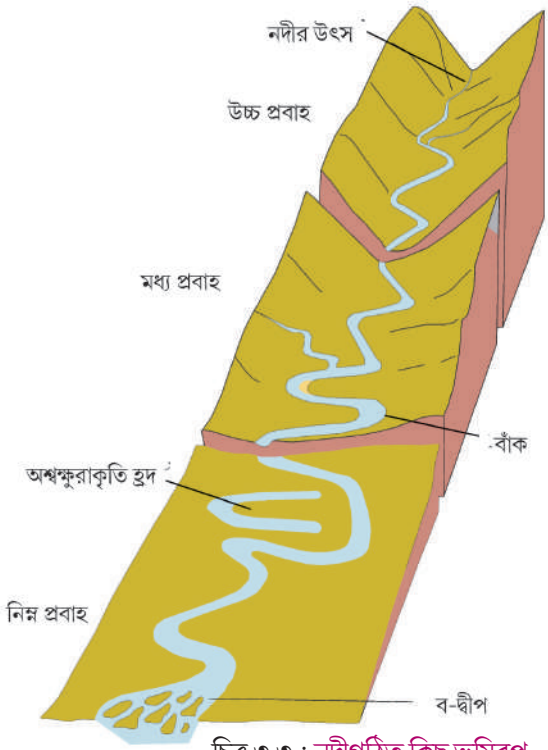

চিত্র ৩.৩ : নদীগঠিত কিছু ভূমিরূপ

উপদ্বীপীয় নদীর বেশির ভাগই ঋতুকালীন, বৃষ্টিপাতের ফলে পরিপুষ্ট থাকে। শুষ্ক ঋতুতে বেশিব ভাগ নদীর জল শুকিয়ে যায়। হিমালয়থেকে উৎপন্ন নদীগুলোর তুলনায় উপদ্বীপীয় নদীগুলো ছোটো এবং সংকীর্ণ। নদীগুলো মধ্যভাগের উঁচু অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। তোমরা এরূপ দুটি নদীর নাম খুঁজে বের করো। দাক্ষিণাত্য মালভূমির বেশির ভাগ নদী পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদনদী/উত্তরের নদনদীসমূহ (Himalayan Rivers) :

হিমালয়ের প্রধান নদীগুলি হল সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র। এই নদী গুলি দীর্ঘ এবং এগুলির সাথে অনেক বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ উপনদী মিলিত হয়েছে। নদীপ্রবাহ বলতে একটি নদী ও তার উপনদীসমূহের প্রবাহকে বুঝায়।

সিন্ধু নদের প্রবাহ : তিব্বতের মানস সরোবরের কাছ থেকে সিন্ধু নদের উৎপত্তি। এটি প্রথমে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে জম্মু-কাশ্মীরের লাদাক জেলার উপর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এই অংশে চিত্তাকর্ষক, গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাত সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন উপনদী যেমন : জাস্কর (Zaskar), নুব্রা (Nubra), শ্যায়োক (Shyok) এবং হুনজা (Hunza) ইত্যাদি কাশ্মীরে সিন্ধুর সাথে মিশেছে। এই নদ বালতিস্থান (Baltistan) এবং গিলগিট (Gilgit) এর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অ্যাটোক (Attock) পর্বতে এসে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। পাকিস্তানের মিথানকোট (Mithankot) -এর নিকট সত্‌লুজ (শতদ্রু), বিপাশা, রবি (ইরাবতী), চেনাব (চন্দ্রভাগা), ঝিলাম (বিতস্তা) প্রভৃতি উপনদী সিন্ধু নদের সাথে মিলিত হয়েছে। এরপর

চিত্র ৩.৪ : ভারতের প্রধান নদনদী ও হ্রদসমূহ।

সিন্ধু নদ দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে করাচির পূর্ব দিক দিয়ে আরবসাগরে মিশেছে। সিন্ধু সমভূমি মৃদু ঢালবিশিষ্ট, এখানে এই নদ ধীরে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদের দৈর্ঘ্য ২৯০০ কিমি। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীগুলির মধ্যে সিন্ধু নদ একটি। সিন্ধু নদের অববাহিকার এক-তৃতীয়াংশ ভারতের জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাবে অবস্থিত। বাকি অংশ পাকিস্তানে রয়েছে।

জান কি ? সিন্ধু জল বণ্টন চুক্তি (Indian Water Treaty, ১৯৬০) অনুযায়ী ভারত জলপ্রবাহের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র ব্যবহার করতে পারে। এই জল বিশেষত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের জলসেচে ব্যবহার করা হয়।

গঙ্গা নদীর প্রবাহ : গঙ্গা নদীর মূল জলধারা হল ভাগীরথী। উত্তরাখণ্ডে উৎসের কাছে গঙ্গার নাম ভাগীরথী। গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ থেকে শুরু হয়ে উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সাথে মিশেছে। ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলিত প্রবাহ গঙ্গা নামে হরিদ্বারের কাছে সমভূমিতে পতিত হয়েছে। উৎস থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গার উচ্চগতি।

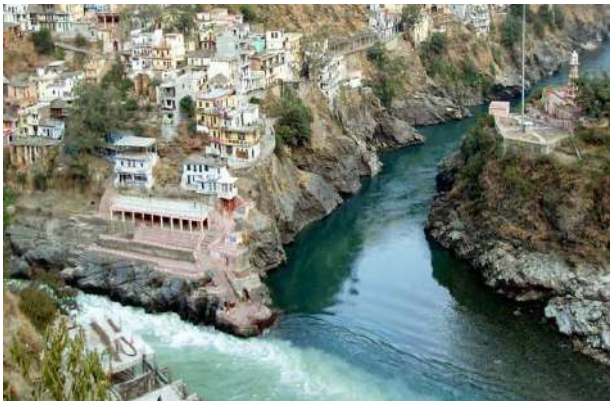

চিত্র ৩.৫ : দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলিত প্রবাহ।

হিমালয় থেকে উৎপন্ন অনেক উপনদী গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। এদের মধ্যে কতগুলো প্রধান উপনদী যমুনা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক হিমালয়ের যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে যমুনার উৎপত্তি। এই নদী গঙ্গার ডান তীরে অবস্থিত এবং গঙ্গার সাথে সমান্তরালভাবে কোশী হয়ে এলাহাবাদে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। নেপাল হিমালয় থেকে ঘর্ঘরা, গণ্ডক এবং কোশী নদীর উৎপত্তি। এই নদীগুলির দ্বারা প্রতি বছর উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়। ফলে প্রচুর জীবন এবং ধনসম্পত্তির ক্ষতি হলেও বিস্তীর্ণ কৃষিভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

উপদ্বীপীয় উচ্চভূমি থেকে আগত প্রধান উপনদীগুলি হল চম্বল, বেতোয়া এবং শোণ। এই নদীগুলো অনুর্বর শুষ্ক অঞ্চল থেকে আগত এবং আকৃতিতে ছোটো বলে জলবহনের ক্ষমতা কম।

জান কি ? *নমামি গঙ্গা প্রকল্পটি (The Namami Gange Programme) হল একটি সুসংহত একত্রিত সংরক্ষণ প্রকল্প (Integrated Conservation Mission) যা কি না ২০১৪ সালের জুনমাসে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারত সরকার চালু করে — ক) গঙ্গার দূষণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ, জল সংরক্ষণ। খ) জাতীয় নদীটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটি হল একটি জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প (Flagship Programme)। এই বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানতে হলে তোমরা http://nmog.nic.in/NamamiGanga.sspx# দেখবে।*

গঙ্গার ডান ও বাম তীরের উপনদীগুলো প্রচুর জলসহ পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কা পর্যন্ত পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। এটিই গঙ্গার ব-দ্বীপের সর্বোত্তরের অংশ। এখানেই গঙ্গা বিভাজিত হয়েছে; ভাগীরথী এবং হুগলি (শাখা নদী) নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ব-দ্বীপের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। গঙ্গার প্রধান অংশটি বাংলাদেশে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। পরবর্তীতে নিম্নপ্রবাহে এটি মেঘনা নামে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ মেঘনারূপে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। নদীর পলি দ্বারা গঠিত এই ব-দ্বীপটির নাম **সুন্দরবন ব-দ্বীপ**।

জান কি ? সুন্দরবন বদ্বীপ নামটি এসেছে সুন্দরী গাছ থেকে, যেগুলো জলাভূমিতে ভালোভাবে জন্মায় ও শ্বাসমূল থাকে। এটা পৃথিবীর বৃহত্তম ও দ্রুত গঠিত হওয়া একটি ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল।

গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২৫০০ কিমি। চিত্র ৩.৪ অনুসারে গঙ্গা নদীর প্রবাহ দেখে গঙ্গা নদীর বিভিন্ন প্রকার জলনির্গমন প্রণালীগুলো খুঁজে বের করো। আম্বালা পর্বত হল সিন্ধু ও গঙ্গার জলবিভাজিকা। আম্বালা থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত গঙ্গার বিস্তার প্রায় ১৮০০ কিমি হলেও এ অঞ্চলে গঙ্গার প্রবাহের ঢাল ৩০০মিটারের বেশি নয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রায় প্রতি ছয় কিমিতে প্রবাহের ঢাল এক মিটার করে বেড়েছে। ফলে নদীর গতিপথে অনেক বড়ো বড়ো বাঁক (Meander) সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ

ব্রহ্মপুত্র নদ সিন্ধু ও সতলুজ (শতদ্রু)-এর উৎসের খুব কাছে তিব্বতের মানসসরোবরের পূর্ব দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হয়েছে। এই নদ সিন্ধু নদ থেকে সামান্য ছোটো এবং বেশির ভাগ অংশ ভারতের বাইরে অবস্থিত। এই নদ পূর্বদিকে হিমালয়ের প্রায় সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে। **নামচাবারওয়া (৭৭৫৭ মি)-তে এসে 'U' আকৃতিতে বেঁকে একটি সংকীর্ণ গিরিখাত দিয়ে অরুণাচল প্রদেশের** ওপর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এখানে এর নাম হল দিহং । এই নদী দিবাং, লোহিত এবং অন্যান্য অনেক উপনদীর সাথে মিশে ব্রহ্মপুত্র নামে ভারতের আসামে প্রবেশ করেছে।

জান কি ? তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের নাম সাংপো এবং যমুনা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, পরে মেঘনার মিলিত প্রবাহ রূপে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

তিব্বতের শুষ্ক ও ঠান্ডা অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত জলের পরিমাণ কম হওয়ার ফলে পলিবহনের পরিমাণও কম। অপরদিকে ভারতে অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্রচুর জল ও পরিমিত পলি বহন করে আনে। আসামে ব্রহ্মপুত্র নদ তার গতিপথে অনেক নদীদ্বীপ গঠন করেছে। তোমার কি মনে আছে, পৃথিবীর বৃহত্তম নদীদ্বীপটি ব্রহ্মপুত্র নদেই সৃষ্টি হয়েছে ?

প্রতি বছর বর্ষাকালে নদীতীর প্লাবিত হয় যার কারণে আসাম ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিধ্বংসী বন্যা হয়। প্রচুর পলি সঞ্চয়ের ফলে উত্তর ভারতের নদীগুলোর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পলি সঞ্চয়ের ফলে গতিপথে অনেক বালুচর ও নদীদ্বীপ দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্রের গতি নিয়ত পরিবর্তনশীল।

উপদ্বীপীয় নদীসমূহ : (The Peninsular Rivers)

ভারতের উপদ্বীপীয় অঞ্চলের প্রধান নদীগুলো পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই নদীগুলো ক্রমশ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। প্রধান নদীগুলো হল মহানদী গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী প্রভৃতি। নদীগুলি পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই নদীগুলোর মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে পশ্চিম দিকে কিছু ছোটোবড়ো নদী প্রবাহিত হয়েছে। এদের মধ্যে নর্মদা ও তাপ্তী দীর্ঘতম এবং নদীগুলোর মোহনায় ছোটো ব-দ্বীপ আছে। উপদ্বীপীয় নদীগুলোর দৈর্ঘ্য কম এবং সংকীর্ণ অববাহিকাবিশিষ্ট।

নর্মদা নদী :

মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক পাহাড় থেকে নর্মদা নদীর উৎপত্তি । নদীটি ১৩১২ কিমি দীর্ঘ। নদীটি পশ্চিমদিকে গ্রস্ত উপত্যকার ফাটলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সমুদ্রসন্নিহিত স্থানে নর্মদা নদীর সৌন্দর্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। জব্বলপুরের কাছে মার্বেল পাথরের ভূমি ভেদ করে গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করেছে। এই নদীর গতিপথে ধুঁয়াধার জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে।পর্বতের খাড়া ঢালে নদীর নিমজ্জিত রূপটি খুবই মনোরম। নর্মদার উপনদীগুলো খুব ছোটো এবং অধিকাংশই নদীর ডানদিকে রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাট রাজ্য নর্মদা অববাহিকার অংশ বিশেষ।

জান কি ? *নর্মদা নদী সংরক্ষণ প্রকল্পটি মধ্যপ্রদেশ সরকার গ্রহণ করেছেন যা নাকি "নমামি দেবী নর্মদে" (Namami Devi Narmade) নামে পরিচিত। তোমরা এসম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে হলে http://www.namamidevinarmade.mp.gov.in দেখতে পারো।*

তাপ্তী নদী :

মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার সাতপুরা পর্বত থেকে তাপ্তী নদী উৎপন্ন হয়েছে। তাপ্তী নদীর দৈর্ঘ্য ৭৩০ কিমি, এটি নর্মদা নদীর সমান্তরালে গ্রস্ত উপত্যকার ফাটলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীর অববাহিকা মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও আরবসাগরের মধ্যবর্তী তাপ্তী নদীর উপকূল ভাগ খুবই সংকীর্ণ। ফলে উপকূলীয় অংশে নদী খুব ছোটো। এছাড়া পশ্চিমবাহিনী অন্যান্য নদীগুলো হল সবরমতী, মাহি, ভারতপৌঝা, পেরিয়র প্রভৃতি।

গোদাবরী নদী :

উপদ্বীপীয় অংশের দীর্ঘতম নদী হল গোদাবরী। এই নদী পশ্চিমঘাট পর্বতের কাছে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ কিমি। এই নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই নদী অববাহিকার অধিকাংশই মহারাষ্ট্র (প্রায় ৫০শতাংশ), মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত। গোদাবরীর বিভিন্ন উপনদীগুলি হল পূর্ণা, ওয়ার্ধা, প্রাণহিতা, মঞ্জিরা, পেনগঙ্গা প্রভৃতি। এর মধ্যে মঞ্জিরা, ওয়েনগঙ্গা, পেনগঙ্গার দৈর্ঘ্য বেশি। গোদাবরী নদীকে 'দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা'ও বলা হয়।

মহানদী নদী :

ছোটোনাগপুর মালভুমির উচ্চ অংশ থেকে মহানদী নদীর উৎপত্তি। এই নদী ওড়িশার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্ববাহিনী নদীরূপে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৬০ কিমি। এই নদী অববাহিকা মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত। মহানদীর প্রধান উপনদীগুলি হল শিশুনাথ, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী।

কৃষ্ণা নদী :

মহাবালেশ্বরের নিকটবর্তী প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪০০ কিমি। পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। তুঙ্গভদ্রা, কয়না, ঘাটপ্রভা, কুশী, ভীমা প্রভৃতি কৃষ্ণার প্রধান উপনদী। এর অববাহিকা মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

কাবেরী নদী :

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ব্রহ্মগিরি শিখর থেকে কাবেরী নদী উৎপন্ন হয়েছে। তামিলনাড়ু রাজ্যের কোড্ডালুরের দক্ষিণ দিক দিয়ে পূর্ববাহিনী নদীরূপে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কাবেরী নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৬০ কিমি। এই নদীর প্রধান উপনদীগুলো হল অমরাবতী, ভবানী, হেমাবতী, কবিনী প্রভৃতি। এই নদী অববাহিকা কর্নাটক, কেরালা এবং তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত।

জান কি ? *ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপ্রপাত হল কৃষ্ণা নদীর শিবসমুদ্রম। এখানকার জলপ্রপাত থেকে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ মহীশূর, বেঙ্গালুরু এবং কোলার স্বর্ণখনিতে সরবরাহ করা হয়।*

বের করো : ভারতের বৃহত্তম জলপ্রপাতটির নাম কী ?

এই নদীগুলো ছাড়াও পূর্ববাহিনী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো হল দামোদর, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি। মানচিত্রে এদের চিহ্নিত করো।

জান কি ? পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জলের মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগই লবণাক্ত জল। সুপেয় জলের পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ মাত্র, তবে এর ৩/৪ ভাগ বরফাবৃত।

হ্রদ (Lakes) :

তোমরা অনেকেই হয়তো কাশ্মীর উপত্যকার ডাল হ্রদের সাথে পরিচিত। ডাল হ্রদের সৌন্দর্য, হাউজবোট, শিকারা প্রভৃতি প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটককে আকর্ষণ করে। অনুরূপভাবে হ্রদের নিকটস্থ ছোটো ছোটো দর্শনীয় স্থান, নৌকাবিহার, সাঁতার প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক

বের করো : বৃহদাকার হ্রদগুলিকে সাগর বলা হয়, যেমন কাস্পিয়ান সাগর, মৃতসাগর, আরল সাগর।

জিনিসও পর্যটকদের সমভাবে আকর্ষণ করে। ভেবে দেখো, শ্রীনগর, নৈনিতাল ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে এরূপ মনোমুগ্ধকর হ্রদ যদি না থাকত তবে বর্তমান সময়ের মতো পর্যটকদেরকে কি সমভাবে আকৃষ্ট করতে পারতো ? কখনো কি জানতে চেষ্টা করেছ যে, হ্রদ পর্যটকদের কীভাবে আকর্ষণ করে ? হ্রদ শুধু পর্যটকদের আকর্ষণই করে না, মানুষের বিভিন্ন উপকারও লাগে।

ভারতে অনেক হ্রদ আছে। আকৃতি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গঠন অনুসারে এই হ্রদগুলি বিভিন্ন রকম। অধিকাংশ হ্রদ চিরস্থায়ী, আবার কিছু হ্রদ শুধুমাত্র বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে পুষ্ট থাকে। যেমন, শুষ্কপ্রায় অঞ্চলের নদী অববাহিকার হ্রদসমূহ। হিমবাহ ও বরফস্তুপ দ্বারা কিছু হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুপ্রবাহ, নদীর কাজ এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলেও হ্রদ সৃষ্টি হয়।

বর্ষাকালে মধ্য ও নিম্নগতিতে বন্যার সৃষ্টি হয় এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, নদীচর, মিয়েন্ডার সৃষ্টি হয়। উপকূলভাগে উপহ্রদ সৃষ্টি হয়, যেমন- চিল্কা হ্রদ, পুলিকট হ্রদ, কোল্লেরু হ্রদ প্রভৃতি। অন্তঃদেশীয় নদীপ্রবাহ দ্বারা কখনো-কখনো ঋতুকালীন হ্রদ দেখা যায়। যেমন- রাজস্থানের সম্বর হ্রদ, এটি লবণাক্ত হ্রদ। এই হ্রদের জল লবণ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

বেশির ভাগ সুপেয় জলের হ্রদ হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত। মূলত এগুলো হিমবাহ থেকে সৃষ্ট। অন্যভাবে বলা যায়, হিমবাহ নদী অববাহিকা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় তুষার গলে হ্রদের সৃষ্টি করে। ভূ-আলোড়নের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের উলার হ্রদ সৃষ্টি

চিত্র ৩.৬ : লোকটাক হ্রদ

কাজ

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হ্রদের তালিকা তৈরি করো এবং মানচিত্রে হ্রদসমূহকে চিহ্নিত করো।

হয়েছে। এটা ভারতের বৃহত্তম সুপেয় জলের হ্রদ। এছাড়া ভারতের অন্যান্য সুপেয় জলের হ্রদগুলো হল ডাল হ্রদ, ভীমতাল, নৈনিতাল, লোকটাক, বরাপানি প্রভৃতি (চিত্র. ৩.৬)। এছাড়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ দিয়ে জলাধার নির্মাণের ফলেও হ্রদের সৃষ্টি হয়। যেমন- গুরুগোবিন্দ সাগর (ভাকরা নাঙ্গাল প্রকল্প)।

মানবজীবনে হ্রদের অবদান অপরিসীম। একটি হ্রদ সর্বদা একটি নদীকে প্রবহমান রাখে। খুব বৃষ্টিপাতের সময় হ্রদ বন্যা থেকে রক্ষা করে, আবার শুখা মরশুমে নদীতে জলপ্রবাহ সাবলীল রাখে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে হ্রদের জল ব্যবহার হয়। সন্নিহিত অঞ্চলের জলবায়ু স্বাভাবিক রাখতে জলজ বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে, বিশেষত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পর্যটনের উন্নতিতে হ্রদের ভূমিকা অপরিসীম।

অর্থনৈতিক উন্নতিতে নদনদীর প্রভাব (Role of Rivers in the Economy) :

মানব সভ্যতা সৃষ্টিতে নদনদীর অবদান অনস্বীকার্য। জলের সাধারণ উৎস হল নদী। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপে জল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই প্রাচীনকাল থেকেই নদীকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। তোমার রাজ্যের নদী তীরবর্তী শহরগুলোর তালিকা তৈরি করো।

জলসেচ, নৌচলাচল, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে নদীর অবদান অপরিসীম। বিশেষত ভারতের মতো কৃষিনির্ভর দেশে নদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জাতীয় নদী সংরক্ষণ পরিকল্পনা (National River Conservation Plan-NRCP)

১৯৮৫ সালে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান (Ganga Action Plan - GAP), চালু করে দেশের নদী পরিষ্কার প্রকল্প আরম্ভ করা হয়। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য নদীগুলোকে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানে যুক্ত করে এই প্রকল্পকে সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৯৫ সালে এই প্রকল্পকে জাতীয় নদী সংরক্ষণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশের জলের প্রধান উৎস নদীগুলোতে বিভিন্ন দূষণ হ্রাসমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে, নদীর জলের গুণমান উন্নত করাই হল জাতীয় নদী সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

উৎস : http://nrcd.nic.in/nrcp.pd (25.07.17)

নদীজল দূষণ (River Pollution) : গৃহস্থালি, কলকারখানা, শিল্প ও কৃষিতে নদীর জলের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে নদীর জলের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। এরফলে নদীর গভীরতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে পয়:প্রণালী ও কলকারখানার বর্জ্য দ্বারাও নদীগর্ভ ভরাট হচ্ছে, এর ফলে নদীর জলধারা যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি নদীর নিকাশিব্যবস্থাও ব্যাহত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি গঙ্গার স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ থাকত তবে ২০ কিমি পর্যন্ত বড়ো শহরকে দূষণমুক্ত রাখতে সক্ষম হত। কিন্তু শহরীকরণ ও শিল্পায়নের ফলে নদীদূষণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তুমি কি এমন কোনো পরিকল্পনা সম্পর্কে জান ? নদীর দূষিত জল আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলে ? 'বিশুদ্ধ জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না' — এই সম্পর্কে তোমার ক্লাসে একটি আলোচনা ও বিতর্ক সভার আয়োজন করো।

অনুশীলনী

১) শুদ্ধ উত্তরটি বাছাই কর :

ক) বৃক্ষের শাখার মতো জলনির্গমন প্রণালীকে কী বলে ?

অ) বৃক্ষরূপী জলনির্গমন প্রণালী আ) জাফরিরূপী জলনির্গমন প্রণালী

ই) আয়তাকার জলনির্গমন প্রণালী ঈ) কেন্দ্রাতিগ জলনির্গমন প্রাণালী।

খ) উলার হ্রদ কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?

অ) রাজস্থান　　আ) উত্তর প্রদেশ

ই) পাঞ্জাব　　ঈ) জম্মু ও কাশ্মীর।

গ) নর্মদা নদীর উৎসস্থল কোথায় ?

অ) সাতপুরা　　আ) অমরকণ্টক

ই) ব্রহ্মগিরি　　ঈ) পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ঢাল।

ঘ) ভারত উপদ্বীপের দীর্ঘতম নদী কোন্‌টি ?

অ) নর্মদা　　আ) গোদাবরী

ই) কৃষ্ণা　　ঈ) মহানদী।

ঙ) নীচের হ্রদগুলির মধ্যে লবণাক্ত জলের হ্রদ কোন্‌টি ?

অ) সম্বর　　আ) ডাল

ই) উলার　　ঈ) গোবিন্দসাগর।

চ) গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে কোন্ নদী প্রবাহিত হয়েছে ?

অ) মহানদী　　আ) তুঙ্গভদ্রা

ই) কৃষ্ণা　　ঈ) তাপ্তী।

২) নীচের প্রশ্নগুলোর বিস্তৃত উত্তর দাও :-

ক) জলবিভাজিকা কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

খ) ভারতের কোন্ নদীর অববাহিকা বৃহত্তম ?

গ) সিন্ধু ও গঙ্গার উৎস কোথায় ?

ঘ) গঙ্গার উৎসস্থলের প্রধান দুটি নদী জলধারার নাম লেখো। এগুলো কোথায় মিলিত হয়ে গঙ্গা নদীর সৃষ্টি করেছে ?

ঙ) তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ দীর্ঘ হলেও পলির পরিমাণ কম কেন ?

চ) কোন্ দুটো নদী উপদ্বীপীয় নদীখাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ?

ছ) নদী ও হ্রদের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো লেখো।

৩) নীচে ভারতের কতগুলো হ্রদের নাম দেওয়া হল। এগুলোকে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম (মনুষ্য নির্মিত)- এই দুভাগে বিভাজিত করো।

ক) উলার　　জ) ডাল

খ) নৈনিতাল　　ঝ) ভীমতাল

গ) গোবিন্দসাগর　　ঞ) লোকটাক

ঘ) বরাপানি　　ট) চিল্কা

ঙ) সম্বর　　ঠ) রানাপ্রতাপ সাগর

চ) নিজামসাগর　　ড) পুলিকট

ছ) নাগার্জুনসাগর　　ঢ) হীরাকুঁদ

৪) হিমালয় ও উপদ্বীপীয় নদীগুলোর মধ্যে পার্থক্য করো।

৫) উপদ্বীপীয় মালভূমির পূর্ববাহী ও পশ্চিমবাহী নদীগুলোর মধ্যে তুলনা করো।

৬) দেশের অর্থনীতিতে নদনদীর গুরুত্ব বর্ণনা করো।

মানচিত্রে দেখাও :

অ) ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত নদীগুলো চিহ্নিত করো : গঙ্গা, সত্‌লুজ, দামোদর, কৃষ্ণা, নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, ব্রহ্মপুত্র।

আ) ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত হ্রদগুলি চিহ্নিত করো : চিল্কা, সম্বর, উলার, পুলিকট, কোল্লেরু।

প্রকল্প/কার্যকারিতা

প্রদত্ত ইঙ্গিতের সাহায্যে নীচের শব্দছকটি মেলাও :

পাশাপাশি-

১) নাগার্জুন সাগর একটি নদী উপত্যকা পরিকল্পনা - নদীটির নাম লেখো।

২) ভারতের দীর্ঘতম নদী

৩) বিয়াস কুণ্ড থেকে উৎপন্ন নদী।

৪) মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলা থেকে উৎপন্ন নদী যা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ।

৫) পশ্চিমবঙ্গের দুঃখের নদী হিসাবে যে নদী পরিচিত।

৬) যে নদীর জলাধার থেকে ইন্দিরা গান্ধি খাল খনন করা হয়েছে।

৭) যে নদীর উৎস 'রোটাং পাস' এর নিকটে অবস্থিত ।

৮) উপদ্বীপের দীর্ঘতম নদী।

ওপর নীচ-

৯) সিন্ধুনদের যে শাখাটি হিমাচল প্রদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

১০) যে নদীটি চ্যুতির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আরবসাগরে মিশেছে।

১১) দক্ষিণ ভারতের একটি নদী যা গ্রীষ্ম ও শীতে সব সময় বৃষ্টির জলে পুষ্ট থাকে।

১২) এই নদী লাদাক, গিলগিট এবং পাকিস্তানের উপর দিয়ে প্রবাহিত।

১৩) ভারতীয় মরুভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী।

১৪) পাকিস্তানের চন্দ্রভাগা নদীর সাথে এই নদী মিলিত হয়েছে।

১৫) যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন নদী।

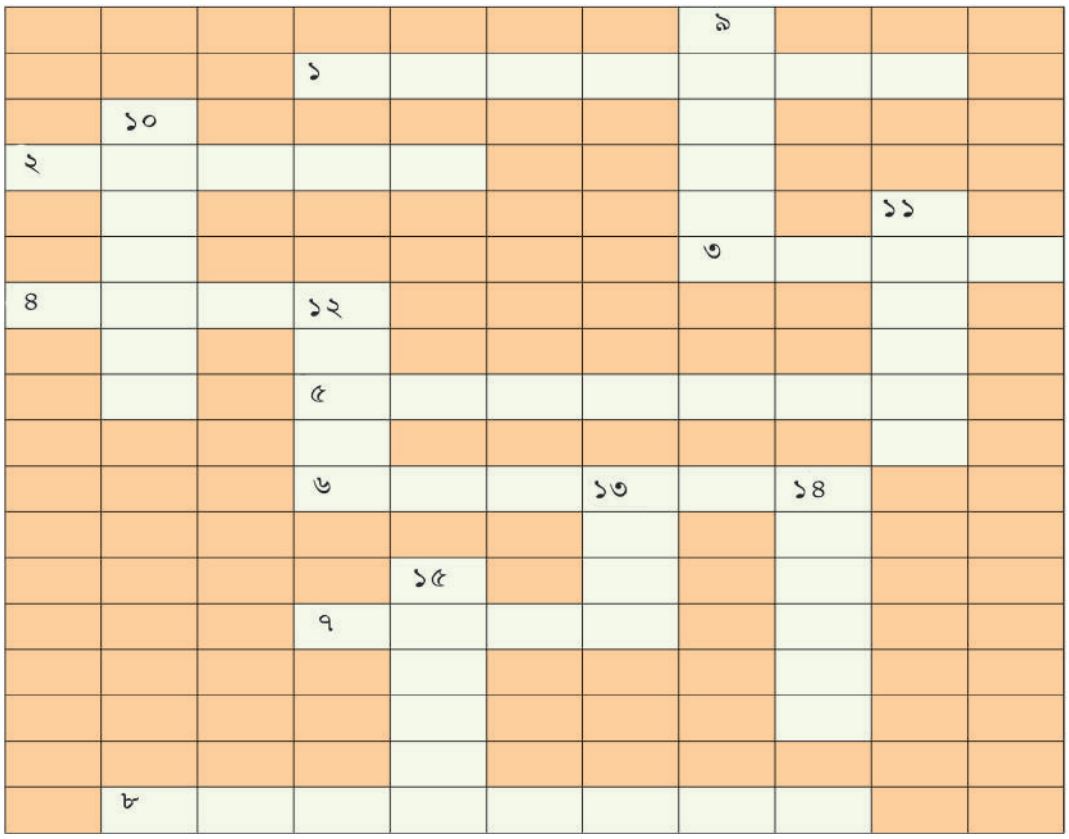

জলবায়ু
(Climate)

8

পূর্ববর্তী দুটো অধ্যায়ে তোমরা দেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা ও নদনদী সম্পর্কে জেনেছ। সেখানে কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের তিনটি মৌলিক উপাদানের দুটো সম্পর্কে পড়েছ। এই অধ্যায়ে তোমরা তৃতীয় উপাদানটি সম্পর্কে জানবে, যা আমাদের দেশের আবহাওয়াগত অবস্থাকে প্রকাশ করবে। ডিসেম্বর মাসে তুমি কেন গরম (Woolen) জামাকাপড় পরিধান কর বা মে মাসে গরম ও অস্বস্তিকর অবস্থা হয় কেন বা জুন-জুলাই মাসে কেন বৃষ্টিপাত হয় ? ভারতের জলবায়ু সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে এসকল প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে।

জলবায়ু বলতে একটি বিশাল অঞ্চলের অনেক বৎসরের (৩০ বছরের বেশি) আবহাওয়ার গড় অবস্থা ও তারতম্যকে বোঝায়। **আবহাওয়া** হল কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের গড় অবস্থা।

জলবায়ু ও আবহাওয়ার উপাদানগুলি একই অর্থাৎ তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা এবং অধঃক্ষেপণ। তোমরা লক্ষ করে থাকবে যে, কোনো একদিনের আবহাওয়াগত অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু বছরের কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসে প্রায় একই অবস্থা বিরাজ করে, অর্থাৎ দিনের বেলায় ঠান্ডা বা গরম, ঝড়ো বা শান্ত হাওয়া, মেঘাচ্ছন্নতা বা মেঘমুক্ততা এবং শুষ্ক বা আর্দ্র প্রভৃতি। এই ধরনের আবহাওয়াগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি বছরকে বিভিন্ন ঋতুতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন- শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল ইত্যাদি।

এর উপর ভিত্তি করেই সারা পৃথিবীকে কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। তুমি কি জান ভারতে কী ধরনের জলবায়ু বিরাজমান এবং এরকম কেন ? আমরা এই অধ্যায়ে এই বিষয় সম্পর্কে জানব।

জান কি ?

* মৌসুমি শব্দটি আরবীয় 'মৌসম' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ ঋতু।
* বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঋতুভেদে বায়ুর বিপরীতমুখী প্রবাহকে মৌসুমিবায়ু বলা হয়।

ভারতের জলবায়ুকে মৌসুমি জলবায়ু বলা হয়। এই ধরনের জলবায়ু এশিয়ার প্রধানত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। যদিও সমগ্র দেশের জলবায়ু মৌসুমি প্রকৃতির, তা সত্ত্বেও অঞ্চলভেদে জলবায়ুর মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এখন আমরা জলবায়ুর দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যেমন- তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে জানব এবং ঋতুভেদে ও স্থানভেদে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তিত হয় তা আলোচনা করব।

গ্রীষ্মকালে রাজস্থানের মরুভূমিতে কোনো কোনো সময় তাপমাত্রা ৫০° সে. পর্যন্ত পৌঁছায়, অপরদিকে একই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ তাপমাত্রা থাকে ২০° সে. এর কাছাকাছি। শীতকালে জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রাসে তাপমাত্রা এত হ্রাস পায় যে, তা -৪৫° সে. পর্যন্ত হয়, একই সময়ে তিরুবনন্তপুরমে তাপমাত্রা ২২° সে. থাকে।

জান কি ? কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের দিনরাতের তাপমাত্রায় ভীষণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। থর মরুভূমিতে দিনের তাপমাত্রা ৫০° সে. পর্যন্ত পৌঁছায় আবার রাতে এই তাপমাত্রা ১৫° সে. পর্যন্ত নেমে আসে। অন্য দিকে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অথবা কেরালায় দিনরাতের তাপমাত্রায় এমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

এখন আমরা অধঃক্ষেপণ সম্পর্কে জানব। অধঃক্ষেপণের তারতম্য কেবলমাত্র তার গঠন বা প্রকারভেদের ওপরই নির্ভর করে না, এর পরিমাণ ঋতু পরিবর্তনের ওপরও নির্ভর করে।

অধঃক্ষেপণ হিমালয়ের উপরিভাগে তুষারপাতরূপে দেখা যায়, এবং বাকি অংশে তা — বৃষ্টি নামে পরিচিত। স্থানভেদে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণেও ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন মেঘালয়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০০ সেমি-এর বেশি, অপরদিকে পশ্চিম রাজস্থান ও লাদাকে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ সেমি-এর কম। দেশের বেশিরভাগ অংশে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত হলেও ভারতের কিছু অংশ, যেমন- তামিলনাড়ু উপকূলে অক্টোবর-নভেম্বর

মাসেই অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয়।

সাধারণত উপকূল অঞ্চলে তাপমাত্রায় বৈপরীত্য কম দেখা যায়, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে তাপমাত্রায় ঋতুগত বৈপরীত্য থাকে। উত্তরের সমভূমি অঞ্চলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়, যার ফলে মানুষের জীবনযাপন যেমন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

বের করো : * রাজস্থানের বাড়ি তৈরিতে পুরু দেওয়াল এবং ছাদ সমতল করা হয় কেন ?
* তরাই অঞ্চল, গোয়া এবং ম্যাঙ্গালোরের ঘরের ছাদগুলো ঢালু প্রকৃতির কেন ?
* আসামের বাড়িগুলো লম্বা পিলার দিয়ে মাটি থেকে কিছুটা উপরে তৈরি করা হয় কেন ?

জলবায়ুর নিয়ন্ত্রকসমূহ (Climate Controls) :

কোনো স্থানের জলবায়ু ছয়টি প্রধান বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেগুলো হল :

অক্ষাংশ, ভূমির উচ্চতা, বায়ুর চাপ ও বায়ু প্রবাহ, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, সমুদ্রস্রোত এবং ভূ-প্রকৃতি।

অক্ষাংশ (Latitude) : পৃথিবীর গোলীয় আকৃতির জন্য বিভিন্ন অক্ষাংশে সূর্যালোক সমানভাবে পড়ে না। এর ফলে নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে বায়ুর উষ্ণতা ক্রমশ কমতে থাকে।

ভূমির উচ্চতা (Altitudes) : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যতই উচ্চতায় ওঠা যায় বায়ুর উষ্ণতা ততই কমতে থাকে। প্রতি ১০০০মি উচ্চতায় ৬.৪° সেন্টিগ্রেড করে তাপমাত্রা কমতে থাকে। এই কারণেই গরমের দিনেও পাহাড়ে ঠান্ডা অনুভূত হয়।

বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহ (Pressure and Wind) : কোনো স্থানের বায়ুর চাপ এবং বায়ুপ্রবাহ অক্ষাংশ এবং ভূমির উচ্চতার ওপর নির্ভর করে। ফলে বায়ুর ঘনত্ব ও তাপমাত্রা কোনো স্থানের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করে।

সমুদ্র থেকে দূরত্ব (Distance from the Sea) : সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলে সমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়। সমুদ্র থেকে দূরত্ব যত বৃদ্ধি পায় জলবায়ুর সমভাবাপন্নতা তত হ্রাস পায়, ফলে বেশি শীত অথবা বেশি গরম অনুভূত হয় (গরমকালে বেশি গরম ও শীতকালে বেশি শীত)। এই ধরনের জলবায়ুকে চরমাভাবাপন্ন বা মহাদেশের জলবায়ু বলে।

সমুদ্রস্রোত (Ocean Currents) : সমুদ্রস্রোতের ফলে সৃষ্ট বায়ু উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রস্রোতের ফলে উদ্ভূত শীতল বায়ু উপকূলবর্তী অঞ্চলকে শীতল রাখে এবং উষ্ণবায়ু উপকূলবর্তী অঞ্চলকে উষ্ণ রাখে।

বের করো : পৃথিবীর বেশির ভাগ মরুভূমি উপক্রান্তীয় মহাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত কেন ?

ভূ-প্রকৃতি (Relief) : কোনো একটি স্থানের জলবায়ু নির্ধারণে ভূ-প্রকৃতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উচ্চ পর্বতমালা উষ্ণ এবং শীতল বায়ুপ্রবাহকে প্রতিহত করে, জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর প্রবাহ পথে উচ্চভূমি থাকলে তা অধঃক্ষেপণে সাহায্য করে। অপরদিকে পর্বতের অনুবাতঢাল তুলনামূলকভাবে শুষ্ক থাকে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হিমালয়ে প্রতিহত হয়ে ভারতে বৃষ্টিপাত ঘটায়, অপরদিকে উত্তরপূর্ব শীতল বায়ুকে প্রতিহত করে ভারতকে তীব্র শীতলবায়ুর হাত থেকে রক্ষা করে।

ভারতের জলবায়ু নিয়ন্ত্রকসমূহ (Factors Affecting India's Climate) :

অক্ষাংশ (Latitude) :

কর্কটক্রান্তিরেখা ভারতের প্রায় মাঝ বরাবর পশ্চিমে কচ্ছের রণ থেকে পূর্বে মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের প্রায় অর্ধেক অংশ কর্কটক্রান্তি রেখার দক্ষিণাংশে অবস্থিত, যা ক্রান্তীয় অঞ্চল এবং বাকি অংশ কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে উপক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। সুতরাং ভারতের জলবায়ু ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ভূমির উচ্চতা (Altitude) :

ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত অবস্থিত, যার গড় উচ্চতা ৬০০০ মিটার। দেশের বিশাল অংশ জুড়ে আছে উপকূল ভূমি, যার সর্বাধিক উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ুপ্রবাহকে হিমালয় পর্বত প্রতিহত করে বলে উপমহাদেশে এই বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। হিমালয় পর্বতমালার অবস্থানের জন্য মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় ভারতীয় উপমহাদেশে মৃদু শীত অনুভূত হয়।

বায়ুর চাপ ও বায়ুপ্রবাহ (Pressure and Wind) :

বায়ুমণ্ডলের নিম্নলিখিত অবস্থাগুলো ভারতীয় আবহাওয়াগত অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

- বায়ুচাপ ও ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুপ্রবাহ
- ঊর্ধ্বাকাশের বায়ু সঞ্চালন এবং
- পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ও ক্রান্তীয় ঘূর্ণাবর্ত।

ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বায়ুপ্রবাহের অন্তর্গত। এই বায়ু উত্তর গোলার্ধে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং কোরিওলিস বল (Coriolis Force) বা দিক বিক্ষেপক শক্তির প্রবাহে বায়ু বিক্ষিপ্ত হয়ে ডানদিকে প্রবাহিত হয়ে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় এবং সাধারণত এই বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি এবং প্রবাহ স্থলভাগের ওপরে হয় বলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম হয়। সুতরাং এখানে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে বা কম হয়। তাহলে ভারত শুষ্কভূমিতে পরিণত হত কিন্তু এমনটি হয়নি। চলো এখন আমরা জানি কেন এমন হয়নি ?

কোরিওলিস বল : *আবর্তন গতির প্রভাবে পৃথিবী আবর্তিত হয়। কোরিওলিস বলের প্রভাবেই বায়ু উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এটাই 'ফেরেলের সূত্র' হিসাবে পরিচিত।*

ভারতের বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুর চাপ খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। শীতকালে হিমালয়ের উত্তরে উচ্চচাপ বলয় তৈরি হয় এবং এই অঞ্চল থেকে শুষ্ক শীতল বায়ু দক্ষিণে সমুদ্র উপরিভাগে নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে এশিয়ার মধ্যভাগে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয় যার ফলে গ্রীষ্মকালে বায়ুপ্রবাহ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়।

ভারত মহাসাগরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে প্রবাহিত হয় এবং নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে। এরপর কিছুটা ডানদিকে অগ্রসর হয়ে ভারত উপমহাদেশের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। একেই দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলে। এই উষ্ণবায়ু সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

এই অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে একটি বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়, এই বায়ুপ্রবাহকে পশ্চিমাবায়ু প্রভাবিত করে। এই বায়ুপ্রবাহ জেটপ্রবাহ নামে পরিচিত।

জেটপ্রবাহ ২৭° - ৩০° উত্তর অক্ষাশে দেখা যায়। এই

জেটপ্রবাহ (JET STREAM)

জেটপ্রবাহ উচ্চ অক্ষাংশে (১২০০০ মিটারের ওপরে) ট্রপোস্ফিয়ারে পশ্চিমাবায়ু সংকীর্ণ বলয়রূপে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর গতি পরিবর্তনশীল। গ্রীষ্মকালে এর গতি থাকে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১১০ কিমি. এবং শীতকালে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৮৪ কিমি.। বিভিন্ন ধরনের জেটপ্রবাহ সম্পর্কে জানা গেলেও মধ্য অক্ষাংশ ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলেই জেটপ্রবাহ বেশি দেখা যায়।

কারণে এই বায়ুপ্রবাহকে উপক্রান্তীয় পশ্চিমা জেটপ্রবাহ বলা হয়। কেবলমাত্র গ্রীষ্মকাল ছাড়া বাকি সারাবছর ধরে এই বায়ুপ্রবাহ হিমালয়ের দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। এই পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়, একে পশ্চিমীঝঞ্ঝা বলে। সূর্যের আবর্তন গতির ফলে গ্রীষ্মকালে এই উপক্রান্তীয় পশ্চিমা জেটপ্রবাহ হিমালয়ের উত্তরে প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে প্রায় ১৪° উ. অক্ষাংশ পর্যন্ত ভারতীয় উপদ্বীপে পুবালি জেটপ্রবাহ প্রবাহিত হয়। যা উপক্রান্তীয় পুবালি জেটপ্রবাহ নামেও পরিচিত।

পশ্চিমিঝঞ্ঝা
(Western Cyclonic Disturbances)

শীতকালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে পশ্চিমিঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়। এই বায়ু ভারতের উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমাংশের আবহাওয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বর্ষাকালেও ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পূবালী বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ঘূর্ণবাত সংগঠিত হয়। এর প্রভাবে পূর্বাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই ঝড় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই ঝড়ের কারণেই অন্ধ্র প্রদেশ এবং ওড়িশা উপকূল অঞ্চলের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল, তা কি তোমরা পড়েছ বা শুনেছ ?

চিত্র ৪.১ : মৌসুমি বায়ুর আগমন

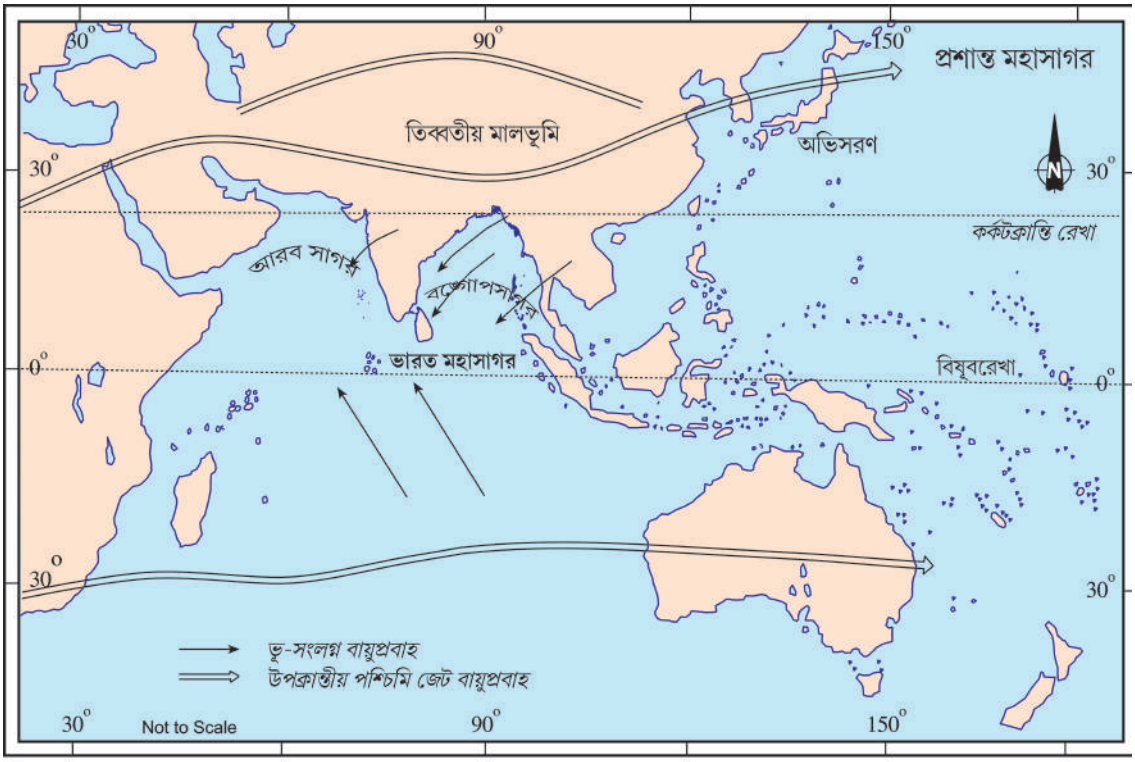

চিত্র ৪.২ : ভারতীয় উপমহাদেশের জানুয়ারি মাসে বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা।

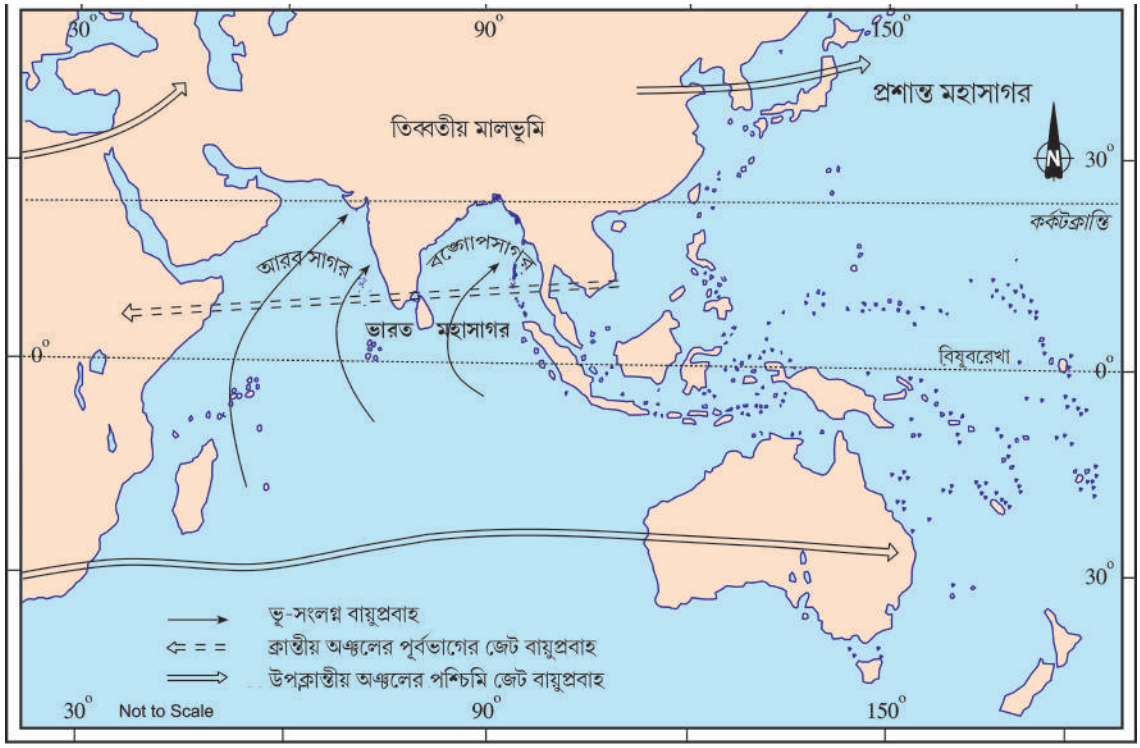

চিত্র ৪.৩ : ভারতীয় উপমহাদেশের জুন মাসের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা।

ভারতের মৌসুমি জলবায়ু :

মৌসুমি বায়ু ভারতের জলবায়ুকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অতীতে নাবিকরা যারা ভারতে আসতেন মৌসুমি বায়ুর গতিবিধি তাদের নজরে আসে। এর ফলে নাবিকরা জাহাজ চালনার সময়ে বায়ুপ্রবাহের এই বিপরীতধর্মী গতিবিধির জন্য অনেক উপকৃত হতেন। বণিক হিসাবে আরবদেশীয় লোকেরা বাণিজ্যের জন্যে এই বায়ুর ওপর নির্ভর করতেন, তাই আরবীয় বণিকরা ঋতুভেদে বিপরীতমুখী এই বায়ুকে 'মৌসুমি (Monsoon) বায়ু' নামে অভিহিত করেন।

ক্রান্তীয় বলয়ের ২০° উত্তর থেকে ২০° দক্ষিণে সাধারণত মৌসুমি বায়ুর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মৌসুমি বায়ু শক্তিশালী ও সক্রিয় হওয়ার কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক) স্থলভাগ ও জলভাগের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্যের ফলে ভারতের স্থলভাগে নিম্নচাপ এবং তুলনামূলকভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে উচ্চচাপ অনুভূত হয়।

খ) গ্রীষ্মকালে আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি (Intertropical Convergence Zone) বলয় স্থান পরিবর্তন করে গাঙ্গেয় সমভূমির উপর অবস্থান করে। এটি হল নিরক্ষীয় বলয় যা নিরক্ষরেখার প্রায় ৫° উত্তরে অবস্থান করে। এই বায়ু বর্ষাকালে ভারতে মৌসুমি বায়ু নামে পরিচিত।

গ) ভারত মহাসাগরের প্রায় ২০° দক্ষিণে মাদাগাসকারের (Madagascar) পূর্ব অঞ্চলে উচ্চচাপ বলয় বিদ্যমান। ভারতীয় মৌসুমি বায়ু এই উচ্চচাপ বলয়ের প্রাবল্য ও অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ঘ) গ্রীষ্মকালে তিব্বতের মালভূমিতে প্রখর সূর্যালোকের ফলে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে ওঠে যায়। ফলে তখন তিব্বতের মালভূমি জুড়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯কিমি. ওপরে এই নিম্নচাপ অবস্থান করে।

ঙ) গ্রীষ্মকালে পশ্চিমি জেটপ্রবাহ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরে সরে যায়। ওই সময়ে উপদ্বীপীয় ভারত পুবালি জেটপ্রবাহের অধীন হয়ে যায়।

আন্তঃক্রান্তীয় অভিসারী অঞ্চল
(Inter Tropical Convergence Zone)

নিরক্ষীয় নিম্নচাপবলয় নিরক্ষরেখার উভয়পার্শ্বে (৫° উ. ও দ.) নিম্নচাপ বলয়কে বোঝায়। এখানে উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু ও দক্ষিণপূর্ব আয়নবায়ু মিলিত হয় এই আয়নবায়ু সূর্যের আপাত গতির পরিপ্রেক্ষিতে নিরক্ষরেখার প্রায় সমান্তরালভাবে উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে।

এছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে, দক্ষিণ মহাসাগরের উপরিস্থ বায়ুচাপের পরিবর্তনের কারণেও মৌসুমি বায়ু প্রভাবিত হয়। যখন ক্রান্তীয় অঞ্চলে দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে উচ্চচাপ বিরাজ করে তখন ক্রান্তীয় পূর্ব ভারত মহাসাগরে নিম্নচাপ বিরাজ করে। কিন্তু কখনো-কখনো এর বিপরীত অবস্থাও দেখা যায়। পূর্ব ভারত মহাসাগরের তুলনায় পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে বায়ুর চাপ কম থাকে। বায়ুর চাপের পর্যায়ক্রমিক এই পরিবর্তনকে দক্ষিণী দোলন (Southern Oscillations বা SO) বলে। তাহিতি (Tahiti) (প্রশান্ত মহাসাগর, ১৮° দক্ষিণ/১৪৯° প.) এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন (ভারত মহাসাগর, ১২°৩০দক্ষিণ/১৩১° পূর্ব) এর জায়গায় সংগৃহীত বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে মৌসুমি বায়ুর প্রবলতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যায়। যদি এই চাপের পার্থক্য ঋণাত্মক হয় অথবা স্বাভাবিক গড় অপেক্ষা কম হয় বলে প্রতি ২ থেকে ৫ বৎসর অন্তর অন্তর এল নিনো (EL NINO) এর দ্বারা দক্ষিণী দোলন প্রভাবিত হয়। ফলে পেরু উপকূলে শীতল স্রোতের পরিবর্তে উষ্ণস্রোত প্রবাহিত হয়। এই চাপের পরিবর্তন এল নিনোর (EL NINO) সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে একে ENSO (EL NINO Southern Oscillations) বলা হয়।

এল নিনো (EL NINO) :

পেরু উপকূলে প্রবাহিত শীতল স্রোতের পরিবর্তে কখনো কখনো উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয়ে এল নিনো (EL NINO) সৃষ্টি হয়। এটি একটি স্প্যানিশ শব্দ, যার অর্থ শিশু আবার খ্রিস্টপুত্রও বলা হয়। বড়দিনের সময় এই স্রোতের উৎপত্তি হয়। এই এলনিনো (EL NINO) সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ায় ও আয়নবায়ুকে দুর্বল করে।।

মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমন :
(The Onset of the Monsoon and Withdrawal)

আয়নবায়ুর মতো মৌসুমি বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয় না। এজন্য মৌসুমি বায়ুকে খেয়ালি বায়ুও বলা হয়। এই বায়ু ক্রান্তীয় উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠের আবহাওয়াগত অবস্থাকে দোদুল্যমান করে তোলে। মৌসুমি বায়ুর স্থায়িত্বকাল জুন মাসের প্রথম দিক থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ ১০০ দিন থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। মৌসুমি বায়ুর আগমনের সময়ে হঠাৎ করে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এই বৃষ্টি কয়েকদিনব্যাপী স্থায়ী হয়। এই অবস্থা "মৌসুমি বিস্ফোরণ" নামেও পরিচিত এবং এই বৃষ্টিপাতের

ধরন মৌসুমি বৃষ্টিপাত থেকে স্বতন্ত্র। এটাকে প্রাক্ মৌসুমি বর্ষা হিসাবেও আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ দিক থেকে মৌসুমি বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। শাখা দুটো হল আরবসাগরীয় শাখা এবং বঙ্গোপসাগরীয় শাখা। আরবসাগরীয় শাখা ১০দিন পর জুন মাসের ১০ তারিখের কাছাকাছি সময়ে মুম্বাইয়ে প্রবেশ করে। বঙ্গোপসাগরীয় শাখা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে আসামে প্রবেশ করে। সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালায় জলীয় বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গাঙ্গেয় সমভূমিতে বৃষ্টিপাত ঘটায়। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আরবসাগরীয় শাখা সুরাট, কচ্ছ এবং ভারতের মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করে। মৌসুমি বায়ুর আরবসাগরীয় এবং বঙ্গোপসাগরীয় শাখা দুটো গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তর পশ্চিমে মিলিত হয়। জুন মাসের ২৯ তারিখের কাছাকাছি সময়ে বঙ্গোপসাগরীয় শাখা দিল্লিতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানের পূর্বাংশে মৌসুমি বায়ু বিরাজ করে। জুলাই মাসের মধ্যভাগে হিমাচল প্রদেশ এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এই মৌসুমি বায়ু বৃষ্টিপাত ঘটায় (চিত্র ৪.৪)।

মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমন একটি ধীর প্রক্রিয়া (চিত্র. ৪.৫)। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম রাজ্যগুলো থেকে মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ থেকে মৌসুমি বায়ু বিদায় নেয়। এরপর ধীরে ধীরে ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় নেয়। ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে ভারতের বাকি অংশ থেকে মৌসুমি বায়ু বিদায় নেয়।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহের দিনগুলোতে ক্রমশ ভারতীয় দ্বীপগুলিতে বৃষ্টিপাতের সূচনা হয়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় দ্বীপগুলিতে ক্রমশ উত্তর থেকে দক্ষিণে উত্তর-পূর্ব বায়ুরূপে মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তন ঘটে। এই সময় থেকে ভারতে শীতকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাব দেখা যায়।

ঋতু পর্যায় (The Seasons) :

মৌসুমি বায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঋতুবৈচিত্র্য। ঋতুভেদে আবহাওয়ার ভীষণ পরিবর্তন ঘটে। ঋতুর পরিবর্তন ভারতের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। উপকূল অঞ্চলে তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না, তবে বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তুমি যে অঞ্চলে বসবাস কর সেখানে তুমি কতপ্রকার ঋতু দেখতে পাও ? শীতল শীতকাল, উষ্ণ গ্রীষ্মকাল, মৌসুমি বায়ুর আগমনকাল (বর্ষাকাল) এবং মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমনকাল (শরৎকাল) - ভারতে প্রধানত এই চারটি ঋতু দেখা যায়। এসব ঋতুই আবার অঞ্চলভেদে ভিন্ন রকমের হয়।

শীতল শীতকাল (Winter Season) :

উত্তর ভারতে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে শীতের শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। উত্তর ভারতে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি - এই দুই মাস সবচেয়ে বেশি শীত অনুভূত হয়। দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতের দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। পূর্ব উপকূলে চেন্নাইতে গড় তাপমাত্রা যখন ২৪°-২৫° সেন্টিগ্রেড, তখন উত্তরের সমভূমিতে এই তাপমাত্রা ১০°-১৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। এই সময়ে উত্তর ভারতে দিনে গরম ও রাতে ঠান্ডা অনুভূত হয়, শিশিরও দেখা যায়। হিমালয়ের উচ্চ অংশে এইসময় তুষারপাত ঘটে।

শীতকালে দেশের সমগ্র অংশে উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু অবস্থান করে। এই বায়ু স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। স্থলভাগ থেকে প্রবাহিত হওয়ায় এই বায়ু শুষ্ক। তাই তখন দেশের বেশিরভাগ অংশে শুষ্ক ঋতু দেখা যায়। তবে প্রত্যাবর্তন কালে মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এবং এই সময়ে তামিলনাড়ু উপকূলে কিছু পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়— এ অঞ্চলে বায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভাগে প্রবাহিত হয়।

এই সময় দেশের উত্তরাংশে একটি দুর্বল উচ্চ চাপ বলয়ের সৃষ্টি হয় এবং ওই সময় এই অঞ্চল থেকে আসা হাল্কা বাতাস ভূ-প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এসময় আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকে এবং বায়ুপ্রবাহের গতি তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

শীতকালের অপর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এইসময় উত্তরের সমভূমিতে পশ্চিম থেকে উত্তর-পশ্চিম অংশে ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপ ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিম এশিয়া থেকে উদ্ভূত হয় এবং পশ্চিমাবায়ুর সাথে মিলিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এই

চিত্র ৪·৪ : মৌসুমি বায়ুর আগমনকাল।

পশ্চিমাবায়ু শীতকালে সমভূমিতে বৃষ্টিপাত ও পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত ঘটায়। ওই অঞ্চলের লোকেরা এই বৃষ্টিপাতকে 'মহাওয়াত' (Mahawat) বলে। রবিশস্যের জন্য এই বৃষ্টিপাত ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

উপদ্বীপ অঞ্চলকে এই ঋতু বিশেষ প্রভাবিত করে না। সমুদ্রসন্নিহিত হওয়ার ফলে শীতকালে তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না, অর্থাৎ জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

উষ্ণ গ্রীষ্মকাল

[The Hot Weather Season (Summer)] :

উত্তরায়ণের ফলে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের সামনে আসে এবং পৃথিবীর উষ্ণ বলয়সমূহ উত্তরে স্থানান্তরিত হয়। এরফলে ভারতে মার্চ থেকে মে মাস- এই সময়ে তাপমাত্রা বেশি থাকে অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে।

মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বিভিন্ন অক্ষাংশের তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করলে উষ্ণবলয় স্থানান্তরের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়। মার্চ মাসে দাক্ষিণাত্য মালভূমির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকে। এপ্রিলে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশে তাপমাত্রা ৪২° এর কাছাকাছিথাকে। মে মাসে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে সাধারণত তাপমাত্রা ৪৫° সেন্টিগ্রেড থাকে এবং শুষ্কতা বিরাজ করে। সমুদ্র বায়ুর প্রভাবে ভারতের উপকূলীয় অংশে তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকে।

গ্রীষ্মকালে ভারতের উত্তরাংশে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং বায়ুর চাপ কমতে থাকে। মে মাসের শেষদিকে একটি নিম্নচাপ বলয় পশ্চিমে থর মরুভূমির কাছে সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে পাটনার উত্তর-পশ্চিমাংশ, ছোটোনাগপুর মালভূমির পূর্বাংশ এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশ পর্যন্ত এই নিম্নচাপ বলয়কে ঘিরে বায়ুপ্রবাহ চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে।

গ্রীষ্মকালের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল 'লু' (Loo)। এই সময়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে দিনেরবেলায় শক্তিশালী, গরম, শুষ্ক ও ধূলিকণাযুক্ত দমকা হাওয়া প্রবাহিত হয়। কখনো-কখনো এই বাতাস সন্ধ্যা পর্যন্ত বয়ে চলে। 'লু'-এর গরম হাওয়ায় জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। মে মাসে উত্তর ভারতে ধূলিঝড় একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এই ঝড় সাময়িক স্বস্তি প্রদান করে কারণ এই ঝড় তাপমাত্রা কমায়, হাল্কা বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। এই ধূলি ঝড় 'আঁধি' (Thunderstorms) নামে পরিচিত। এই ঋতুতে প্রবল ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ শিলাবৃষ্টি সংঘটিত হয়। এই ঝড় পশ্চিমবঙ্গে 'কালবৈশাখী' নামে পরিচিত।

কেরালা ও কর্ণাটকে গ্রীষ্মকালের শেষদিকে প্রাক্ মৌসুমি বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টি দ্রুত আম পাকাতে সাহায্য করে বলে এই বৃষ্টি 'আম্রবৃষ্টি' হিসাবেও পরিচিত।

মৌসুমি বায়ুর আগমন কাল/বর্ষাকাল (Advancing Monsoon/The Rainy Seasoon) :

জুনের প্রথমদিকে উত্তর ভারতের সমভূমিতে নিম্নচাপ আরও জোরালো হয়। এই নিম্নচাপ দক্ষিণ গোলার্ধের আয়নবায়ুকে আকর্ষণ করে। এই দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু দক্ষিণ মহাসাগরসন্নিহিত উষ্ণ উপক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়। এই বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধাবিত হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুরূপে ভারতে প্রবেশ করে। উষ্ণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে এই বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এই বায়ু খুবই শক্তিশালী এবং গড়ে ৩০কিমি (প্রতি ঘণ্টায়) বেগে প্রবাহিত হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ছাড়া প্রায় একমাসের মধ্যে সমগ্র ভারত মৌসুমি বায়ুর আওতায় চলে আসে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতের আবহাওয়াকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে। বর্ষার শুরুতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার প্রতিবাত ঢালে ২৫০ সেমি. এর বেশি বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশেও এই সময় বৃষ্টিপাত হয়। দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে এই সময় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। খাসি পাহাড়ের দক্ষিণঢালে অবস্থিত মৌসিনরাম পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। গাঙ্গেয় সমভূমিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বৃষ্টিপাত ক্রমশ কমতে থাকে। রাজস্থান এবং গুজরাটের কিছু অংশে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়।

মৌসুমি বায়ুর আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কখনো-কখনো একেবারেই

জান কি ? মৌসিনরাম পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থানই নয়, **স্ট্যালাগমাইট** ও **স্ট্যালাগটাইট** গুহার জন্যও বিখ্যাত।

চিত্র ৪.৫ : মৌসুমিবায়ুর প্রত্যাগমন।

বৃষ্টি হয় না, এই সময় কখনও শুষ্ক ও কখনো আর্দ্র অবস্থা বিরাজ করে। অন্যভাবে বলা যায়, মৌসুমি বৃষ্টিপাত একনাগাড়ে কেবলমাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হয়, ওই সময় কিছু পরিমাণ বৃষ্টি হলেও পরে আবার বৃষ্টিহীন হয়ে যায়। এই বৃষ্টিহীনতা মৌসুমি বায়ুর সঞ্চরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন কারণে মৌসুমিবায়ুর চাপখাত নিরক্ষরেখার উত্তর বা দক্ষিণমুখী সঞ্চরণের ফলে বৃষ্টিপাতের বণ্টনে তারতম্য হয়। যখন মৌসুমিবায়ুর চাপখাতের অক্ষ সমভূমির দিকে থাকে তখন ওই অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে চাপখাতের অক্ষ যখন হিমালয়ের কাছে সরে যায় তখন সমভূমিতে শুষ্ক অবস্থা বিরাজ করে। ওই সময়ে হিমালয়ের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। নদীতে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সমভূমিতে সম্পত্তি ও জনজীবনের ক্ষতি সাধিত হয়। ক্রান্তীয় নিম্নচাপের ঘনত্ব ও গভীরতা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সময়ে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই নিম্নচাপ মৌসুমি বায়ুর চাপখাত ও তার অক্ষকে অনুসরণ করে চলে। এজন্য মৌসুমিবায়ু অনিশ্চিত বায়ু হিসাবেও পরিচিত। বায়ুর এই খামখেয়ালিপনার জন্য বাতাসে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বত্র সমান থাকে না, ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব এবং আগমন ও প্রত্যাগমনের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। একদিকে ভীষণ বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে অপরদিকে থাকে খরা। আবার মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনও অনেকটাই অনিয়মিত। ফলে কোনো কোনো সময়ে সারা ভারতে কৃষকদের কৃষিকাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমন কাল/বর্ষার পরবর্তী অবস্থা (ঋতুর এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন) : (Retreating/Post Monsoons (Transition Season)

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সূর্যের দক্ষিণায়নের ফলে উত্তরের সমভূমিতে মৌসুমি বায়ুর চাপখাত (Monsoon Through) ও নিম্নচাপের খাত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুরূপে মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমন শুরু হয়। অক্টোবরের শুরুতে উত্তরের সমভূমি থেকে মৌসুমি বায়ু ফিরে যায়।

অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে উষ্ণ বর্ষাকাল ক্রমশ শুষ্ক শীতকালে পরিবর্তিত হতে থাকে। মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমনের সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। দিনের তাপমাত্রা থাকে বেশি আর রাতের তাপমাত্রা থাকে কম ও আরামদায়ক। ভূমি তখনও স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। তবে এই সময় উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে দিনেরবেলা খুব অস্বস্তিকর লাগে। এটাকে সাধারণত অক্টোবরের তাপ (October Heat) বলা হয়। অক্টোবরের শেষের দিকে উত্তর ভারতে সূর্যের তাপমাত্রা খুব দ্রুতগতিতে কমতে থাকে।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের নিম্নচাপ ক্রমশ বঙ্গোপসাগরের দিকে সরে যায়। নিম্নচাপের স্থান পরিবর্তনের ফলে আন্দামান ও নিকটবর্তী সাগরে নিম্নচাপজনিত ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। এই বায়ু ভারতের পূর্ব উপকূলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই ক্রান্তীয় ঝড় কখনো-কখনো ধ্বংসাত্মক হয়। জনবহুল গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপে এর প্রভাব বেশি দেখা যায় এবং এরফলে ওই সকল অঞ্চলে প্রচুর জীবনহানি ঘটে ও সম্পত্তি নষ্ট হয়। কখনোক্ষ্ম-কখনো ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলভাগেও এই ঝড়ের প্রভাব পড়ে। এই নিম্নচাপের ফলেই করমণ্ডল উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও ঝড়ের সৃষ্টি হয়।

বৃষ্টিপাতের বণ্টন :

পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বৎসরে প্রায় ৪০০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে পশ্চিম রাজস্থান ও সন্নিহিত হরিয়ানা, গুজরাট ও পাঞ্জাবে বছরে ৬০ সেমি.-র কম বৃষ্টিপাত হয়। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যভাগে এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বঢালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম থাকে। এসকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় কেন ? কম বৃষ্টিপাতযুক্ত তৃতীয় অঞ্চলটি হল জম্মু-কাশ্মীরের লেহ্। দেশের বাকি অংশে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়। ওই সময়ে শুধুমাত্র হিমালয়ে তুষারপাত হয়। মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনের তারতম্যের ফলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও প্রতিবছর পরিবর্তিত হয়। রাজস্থানের গুজরাট এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের অনুবাত ঢালের কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল খরা প্রবণ হয়। আর বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়। (চিত্র ৪.৬ এবং ৪.৭)।

আর্থ-সামাজিক ঐক্যবন্ধনে মৌসুমি বায়ু :

এরমধ্যেই তোমরা জেনেছ যে, মধ্য এশিয়া থেকে আগত অত্যন্ত শীতল বায়ু থেকে হিমালয় পর্বতমালা এই উপমহাদেশকে রক্ষা করে। একই কারণে একই অক্ষাংশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় উত্তর ভারতের তাপমাত্রা অধিক থাকে। তিনদিকে সমুদ্র থাকায় উপদ্বীপীয় মালভূমিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। এসকল কারণ ছাড়াও মৌসুমি বায়ুও তাপমাত্রাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, তা সত্ত্বেও ভারত উপমহাদেশে একীভূত মৌসুমি বায়ুর ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। বিভিন্ন ঋতুতে বায়ুপ্রবাহ ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে একটি সুন্দর ঋতুপর্যায় দেখা যায়। এমনকি বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা এবং অসম বণ্টনও মৌসুমি বায়ুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীবজন্তু, গাছপালা, বর্ষব্যাপী কৃষিকাজ, মানুষের জীবনশৈলী, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, উৎসব প্রভৃতি আবহমান কাল ধরে মৌসুমি বায়ুর উপর নির্ভরশীল। বছরের পর বছর ভারতের জনসাধারণ উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে মৌসুমি বায়ুর আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। মৌসুমি বায়ু সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থাকে জল সরবরাহ করে ফসল উৎপাদনের গতিকে অব্যাহত রেখেছে। মৌসুমি বায়ুর দ্বারা অধিকাংশ নদীপ্রবাহও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং একটি নদী অববাহিকায় পরিণত হয়।

Devastated by deluge

Haze hazard on road

Hint of an early summer

Tuesday: 28.4 °C

HT Correspondent
New Delhi, January 31

THE MERCURY is soaring, paving the way for what could be an early onset of summer, the weatherman has said. It may touch 30 degrees Celsius within a couple of days in Delhi.

The mercury settled at 28.4 degrees Celsius on Tuesday, nearly six degrees above the average, breaking a decade-old record.

FOG CHECK

Flight operations at Delhi Airport was normal with the runway visibility at 1,500 metres. However, thick fog in the NCR made driving difficult in the early hours.

DELAYED: 17 incoming trains; departure of six trains was rescheduled.

Poorva Express from Howrah, Sampurna Kranti Express from Patna and Rajdhani Special from Mumbai.

RESCHEDULED: Kashi Vishwanath from New Delhi to Varanasi, Lichchivi Express from New Delhi to Muzaffarpur, Bhupeneshwar Raj from New Delhi to Bhupeneshwar, Seldah Raj from New Delhi to Seldah, Sultanpur Express from Delhi to Sultanpur and Janta Express from Delhi to Howrah.

Cold comfort for New Year revellers

Chennai submerged

G.C. Shokhar
Chennai, December 30

IF 2004 was the year of the tsunami, 2005 turned out to be the year of rains and floods in Tamil Nadu. Unlike the tsunami, which affected a belt of six coastal districts in Tamil Nadu and Pondicherry, the floods wreaked havoc across the state.

In five furious spells, the last two being cyclones that weakened before hitting the coast, the rain gods lashed Tamil Nadu from October to December with almost every district drenched and drowned.

Chennai, which was flaunted as an alternative to Bangalore, found itself floating on water on three occasions. The rains and floods killed 350 people. Fields were inundated, crops damaged, roads looked like backwaters. And this was the city that cried for water in summers.

The rains showed up the state's failure to literally tap the resources as 90 tmc of water flowed into the sea. Irrigation tanks and reservoirs were breached. The suburbs were the worst hit as many localities remained under water from October to December.

When the relief efforts began, that brought calamity of another order. Rush for rations resulted in one of the most avoidable tragedies as 48 people were killed in stampedes outside two relief centres.

This was one rain cloud

A day Mumbai won't forget

SORAB Ghaswalla
Mumbai, December 30

JULY 26, 2005 started off as just another soggy day in Mumbai. But, the rainfall was one of the heaviest Mumbai had seen over the past century. As citizens went about their morning chores, they had no inkling that by dusk the city would be swamped.

By sunset, 435 residents had either drowned in their houses or vehicles as rainwater started rising with alarming rapidity. By night, the city and its people were defeated. No transport, no electricity and no place to go. Mumbai was on its knees.

The weather bureau had predicted just another "normal" rainy day for the city. But it poured 944.2 m.m. (three feet of rain) over 24 hours, the highest in 100 years.

Before 26/7, Mumbaiites, used to about 15 cm of rain, would tease, "What's a Mumbai monsoon without some days of disruption?" On 26/7, the joke was on them.

The rain picked up at about 1 p.m. Initially, nobody paid attention. The enormity of the situation hit Mumbaiites at about 5 p.m. By then, many were dead and the low-lying areas of Kurla, Ghatkopar, Andheri, Dadar, Juhu and Kalina were flooded.

Fog is in, get ready for disruptions

A thin blanket of fog enveloped the city in the early hours of Friday. Visibility was reduced to 500 metres in most areas. There

Freezing Kashmir

RASHID Ahmad

Celsius up, temperature takes normal course

WINTER BREAK

After 2 days of biting cold, sun shines

Expect a ballistic winter after western winds are in

HT Correspondent
New Delhi, November 30

ACROSS NORTH India, it's a winter of woes. Amristar is icy with a minimum temperature of 5°C. Snowfall, of up to 78 cm, has blanketed Srinagar. In Delhi, it's still a pleasant nip. This mild wintry condition, however, will definitely not last, says the Met.

In a day or two, winds from Afghanistan, known as western disturbances, will lash the Capital. Conditions are perfect for harsh winter ahead, said Met officials, who have declared "official winter" in Delhi from Thursday.

"Wednesday's morning mist, moisture in the air, low night temperature and the cold winds that hit the city by evening are enough indications for the weather department to declare the onset of winter a day in advance," an official said.

Winter may have been delayed in much of north India by about a fortnight, but it has set in on time in Delhi, he added.

In vast swathes of north India, the past week has been colder than average. "Winter trying to make up for the lost time," the weatherman added in a lighter vein. With temperatures consistently below the average for this year, there is a spectre of this year's winter being colder than usual.

In the ski resort of Gulmarg, there's heavy snow. Night temperature dipped four degrees past normal and Churu in Rajasthan has become bitterly cold. But Delhi continues to be comfortable. Night temperature on Wednesday hovered around 10°C.

"The western disturbances are unpredictable. They might hit Delhi within the next 72 hours or may not for another week. But it is time to get your woollens out. Temperatures will drop progressively in the days to come," said Delhi Met chief R.D. Singh. With mornings getting misty, the dreaded fog may not be far behind. And with pollution levels at a five-year high, the fog this time may be worse.

Delhi has been colder this fortnight compared to the same period last year. The temperature pattern is similar to the record-breaking winter of 2003 — the worst in 40 years.

The Met office says it cannot forecast so far ahead in future. "It may not be record breaking winter, but it will definitely be chillier than an average winter," said a weather official.

The official pointed out that snowfall in Kashmir and Shimla has been heavier and earlier than usual. The temperature in Shimla dropped two degrees below normal. Sundernagar at 4.3 °C was cold too.

Northerly cold winds have struck Rajasthan, affecting normal life last night with Churu and Sriganganagar shivering at 5°C each, about two-three degrees below normal. Nights in Jodhpur, Bikaner, Ajmer and Jaipur divisions have become harsh.

So, it's officially winter in the Capital

Delhi
Max: 25°C, Min: 8 In a day or two, winds from Afghanistan —western disturbances — will lash the Capital. Winter declared from Dec 1.

Srinagar
Max: 8°C, Min: -3 It's a sea of snow there. Like much of Kashmir, it is experiencing sub-zero temperatures and bitterly cold weather.

Amritsar
Max: 21°C, Min: 5 The great plains are extremely cold. The coming days will be worse with expected sub-zero temperatures.

Shimla
Max: 10°C, Min: -4 The Himachal capital is blanketed in heavy snow. Higher reaches are even colder.

কাজ (Activity)

১) ওপরের তথ্যের ভিত্তিতে স্থানের নাম লেখো এবং ঋতু বর্ণনা করো।

২) চেন্নাই এবং মুম্বাই-এর বৃষ্টিপাতের তুলনা করো এবং ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা করো।

৩) বর্ণিত তথ্যের নিরিখে (Case-Study) বন্যা পরিস্থিতির ধংসাত্মক অবস্থা মূল্যায়ন করো।

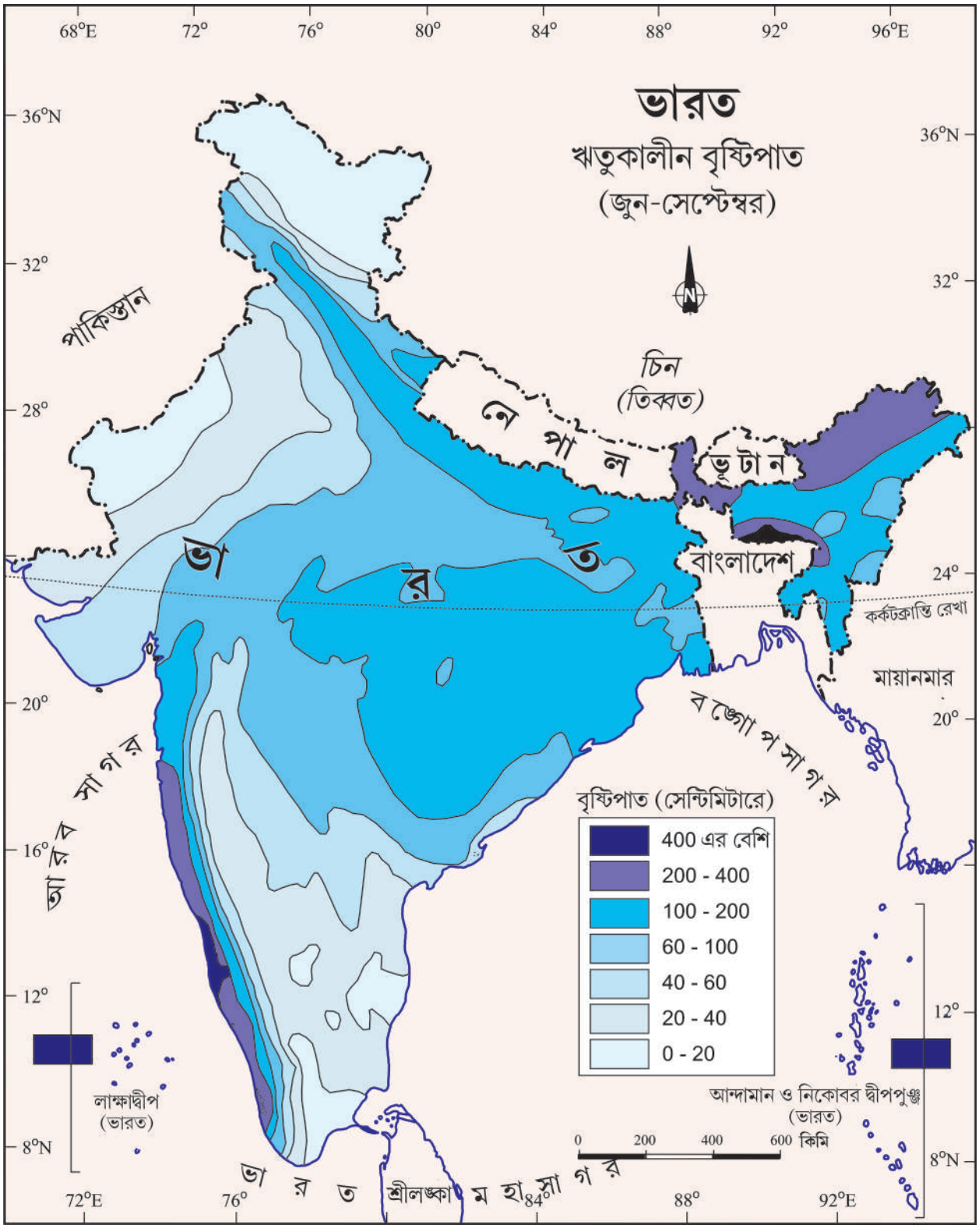

চিত্র ৪.৬ : ঋতুকালীন বৃষ্টিপাত (জুন থেকে সেপ্টেম্বর)

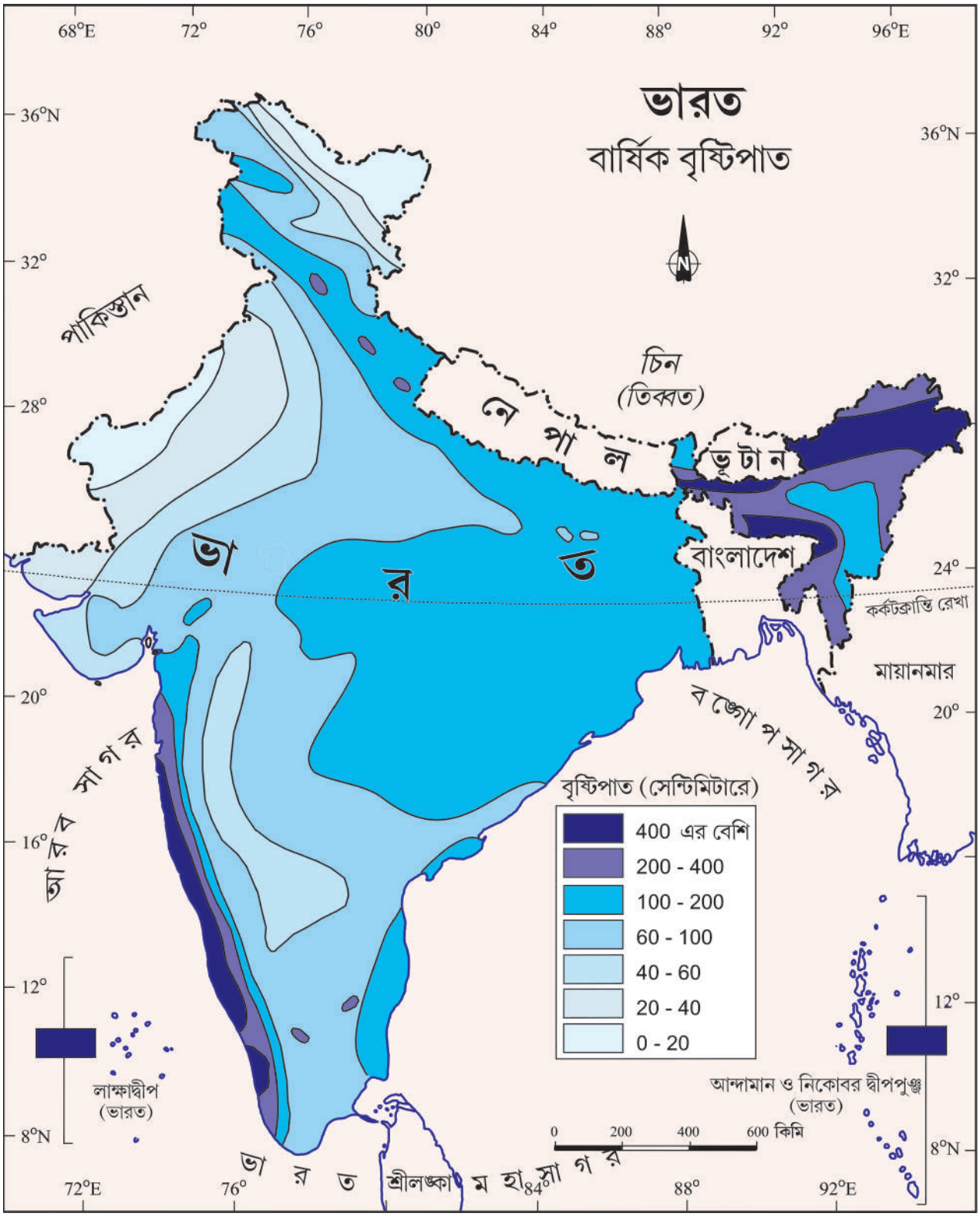

চিত্র ৪.৭: বার্ষিক বৃষ্টিপাত

অনুশীলনী

১) নীচের চারটি বিকল্প থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো।

ক) নীচের কোন্ জায়গায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় ?

অ) শিলচর　　আ) চেরাপুঞ্জি

ই) মৌসিনরাম　　ঈ) গৌহাটি

খ) গ্রীষ্মকালে উত্তরের সমভূমিতে প্রবাহিত বায়ুর নাম হল—

অ) কালবৈশাখি　　আ) আয়নবায়ু

ই) লু　　ঈ) উপরের কোনোটিই নয়

গ) নিম্নলিখিত কোন্ কারণের জন্য শীতকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে বৃষ্টিপাত হয় ?

অ) নিম্নচাপজনিত ঘূর্ণবাত　　আ) পশ্চিমিঝঞ্ঝা

ই) মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমন　　ঈ) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু

ঘ) ভারতে মৌসুমি বায়ুর আগমন ঘটে প্রায়—

অ) মে মাসের শুরুতে　　আ) জুলাই মাসের শুরুতে

ই) জুন মাসের শুরুতে　　ঈ) আগস্ট মাসের শুরুতে

ঙ) নীচের কোন্ বৈশিষ্ট্যটি ভারতে শীতকালীন ঋতুর বৈশিষ্ট্য—

অ) দিনেও গরম, রাতেও গরম　　আ) দিন গরম এবং রাত ঠান্ডা

ই) দিন এবং রাত ঠান্ডা　　ঈ) দিনে ঠান্ডা এবং রাতে গরম

২) নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

ক) ভারতের জলবায়ুর নিয়ন্ত্রকগুলো কী কী ?

খ) ভারতকে কেন 'মৌসুমি জলবায়ুর দেশ' বলা হয় ?

গ) ভারতের কোন্ অঞ্চলে দিনরাতের তাপমাত্রার পার্থক্য সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং কেন ?

ঘ) কোন্ বায়ু মালাবার উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায় ?

ঙ) জেটস্ট্রিম কী ? জেটস্ট্রিম ভারতের জলবায়ুকে কীভাবে প্রভাবিত করে ?

চ) মৌসুমি বায়ু কাকে বলে ? মৌসুমি বায়ুর বিরতি (Break) বলতে কী বোঝ ?

ছ) মৌসুমি বায়ুকে আর্থ-সামাজিক বন্ধন রূপে (Unifying bond) গণ্য করা হয় কেন ?

৩) উত্তর ভারতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে কেন ?

৪) কারণ দেখাও :

ক) ভারত উপমহাদেশজুড়ে বিপরীতধর্মী বাতাস প্রবাহিত হয়।

খ) বছরের নির্দিষ্ট কয়েক মাসে ভারতে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

গ) শীতকালে তামিলনাড়ু উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়।

ঘ) পূর্ব উপকূলে নদীগঠিত সমভূমিতে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় হয়।

ঙ) রাজস্থানের কিছু অংশ, গুজরাট এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের অনুবাত ঢাল খরাপ্রবণ।

৫) উপযুক্ত উদাহরণসহ ভারতের অঞ্চলভিত্তিক জলবায়ুর ভিন্নতা ব্যাখ্যা করো।

৬) মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

৭) ভারতের শীতকালীন জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং আবহাওয়াগত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮) মৌসুমি বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য এবং বৃষ্টিপাতের প্রভাব আলোচনা করো।

মানচিত্র দক্ষতা -

ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দেখাও।

ক) ৪০০ সেমি. এর বেশি বৃষ্টিবহুল অঞ্চল।

খ) ২০ সেমি. এর কম বৃষ্টিবহুল অঞ্চল।

গ) ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর গতিপথ।

প্রকল্প /কাজ -

ক) কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে তোমার অঞ্চলে কী ধরনের নাচ, গান, উৎসব ও বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি করা হয় যা ঐ ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তার তালিকা তৈরি করো। এগুলোর সাথে ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলের সাদৃশ্য আছে কি?
খ) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু বিশেষ ধরনের বৈশিষ্টযুক্ত গ্রামীণ এলাকার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু ছবি সংগ্রহ করো। জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না খুঁজে দেখো।

নিজে করো

ক) টেবিল নং ১-এ ১০টি পরপর স্থানের মাসিক গড় তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেওয়া হল। এগুলোকে তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের লেখচিত্রে দেখাও। এই চিত্র সহজেই তোমাদেরকে বিভিন্ন জায়গার মিল ও গরমিল সম্পর্কে ধারণা দেবে। এই ধরনের একটি লেখচিত্র (চিত্র-১) তোমাদেরকে করে দেওয়া হল। এর থেকে দেশের জলবায়ুগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে। আশা করি এই শিক্ষায় তোমরা খুব আনন্দ পেয়েছ। নীচের কাজগুলো করো :

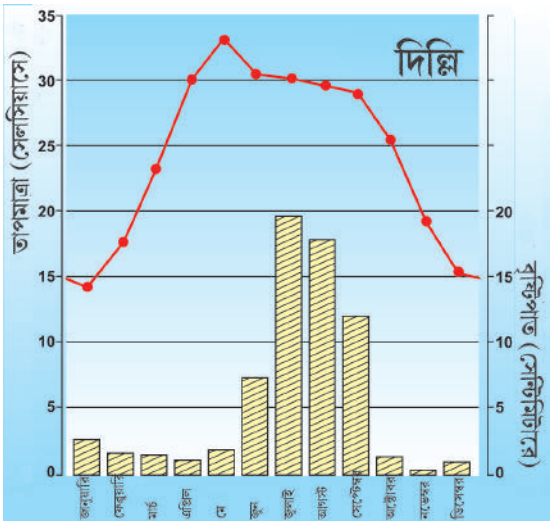

চিত্র - ১: দিল্লির তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত

খ) দশটি স্থানের দু-ধরনের ভিন্নধর্মী জলবায়ুর মধ্যে মিল দেখাও।

অ) নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্ব অনুসারে।

আ) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তাদের উচ্চতা অনুসারে।

গ) ১) দুটো সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের নাম—

২) দুটো সর্বাধিক শুষ্কতম অঞ্চলের নাম—

৩) দুটো সমভাবাপন্ন জলবায়ু অঞ্চলের নাম—

৪) দুটো চরমাভাবাপন্ন জলবায়ু অঞ্চলের নাম—

৫) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আরবসাগরীয় শাখা দ্বারা প্রভাবিত দুটো স্থানের নাম।

৬) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা দ্বারা প্রভাবিত দুটো স্থানের নাম।

৭) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর দুটো শাখার দ্বারা প্রভাবিত দুটো স্থানের নাম।

৮) প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমিবায়ু এবং উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত দুটো স্থানের নাম।

৯) পশ্চিমিঝঞ্ঝার কারণে শীতকালীন বৃষ্টিপাত হয় এমন দুটো স্থানের নাম।

১০) নিম্নলিখিত মাসগুলোতে দুটো করে উষ্ণতম স্থানের নাম লেখো।

অ) ফেব্রুয়ারি আ) এপ্রিল ই) মে ঈ) জুন।

টেবিল – ১

স্থান	অক্ষাংশ	উচ্চতা (মি.)	জানু.	ফেব্রু.	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.	বার্ষিক বৃষ্টিপাত
উষ্ণতা (°সে.)			20.5	22.7	25.2	27.1	26.7	24.2	23.0	23.0	23.1	22.9	18.9	20.2	
বেঙ্গালুরু	12°58'N	909													
বৃষ্টিপাত (সেমি.)			0.7	0.9	1.1	4.5	10.7	7.1	11.1	13.7	16.4	15.3	6.1	1.3	88.9
উষ্ণতা (°সে.)			24.4	24.4	26.7	28.3	30.0	28.9	27.2	27.2	27.2	27.8	27.2	25.0	
মুম্বাই	19° N	11													
বৃষ্টিপাত (সেমি.)			0.2	0.2	–	–	1.8	50.6	61.0	36.9	26.9	4.8	1.0	–	183.4
উষ্ণতা (°সে.)			19.6	22.0	27.1	30.1	30.4	29.9	28.9	28.7	28.9	27.6	23.4	19.7	
কলকাতা	22°34' N	6													
বৃষ্টিপাত (সেমি.)			1.2	2.8	3.4	5.1	13.4	29.0	33.1	33.4	25.3	12.7	2.7	0.4	162.5
উষ্ণতা (°সে.)			14.4	16.7	23.3	30.0	33.3	33.3	30.0	29.4	28.9	25.6	19.4	15.6	
দিল্লি	29° N	219													
বৃষ্টিপাত (সেমি.)			2.5	1.5	1.3	1.0	1.8	7.4	19.3	17.8	11.9	1.3	0.2	1.0	67.0
উষ্ণতা (°সে.)			16.8	19.2	26.6	29.8	33.3	33.9	31.3	29.0	20.1	27.0	20.1	14.9	
যোধপুর	26°18' N	224													
বৃষ্টিপাত (সেমি.)			0.5	0.6	0.3	0.3	1.0	3.1	10.8	13.1	5.7	0.8	0.2	0.2	36.6
উষ্ণতা (°সে.)			24.5	25.7	27.7	30.4	33.0	32.5	31.0	30.2	29.8	28.0	25.9	24.7	
চেন্নাই	13°4' N	7													
বৃষ্টিপাত (সেমি.)			4.6	1.3	1.3	1.8	3.8	4.5	8.7	11.3	11.9	30.6	35.0	13.9	128.6
উষ্ণতা (°সে.)			21.5	23.9	28.3	32.7	35.5	32.0	27.7	27.3	27.9	26.7	23.1	20.7	
নাগপুর	21°9' N	312													
বৃষ্টিপাত (সেমি.)			1.1	2.3	1.7	1.6	2.1	22.2	37.6	28.6	18.5	5.5	2.0	1.0	124.2
উষ্ণতা (°সে.)			9.8	11.3	15.9	18.5	19.2	20.5	21.1	20.9	20.0	17.2	13.3	10.4	
শিলং	24°34' N	1461													
বৃষ্টিপাত (সেমি.)			1.4	2.9	5.6	14.6	29.5	47.6	35.9	34.3	30.2	18.8	3.8	0.6	225.3
উষ্ণতা (°সে.)			26.7	27.3	28.3	28.7	28.6	26.6	26.2	2.6.2	26.5	26.7	26.6	26.5	
তিরুবনন্তপুরম	8°29' N	61													
বৃষ্টিপাত (সেমি.)			2.3	2.1	3.7	10.6	20.8	35.6	22.3	14.6	13.8	27.3	20.6	7.5	181.2
উষ্ণতা (°সে.)			– 8.5	– 7.2	– 0.6	6.1	10.0	14.4	17.2	16.1	12.2	6.1	0.0	– 5.6	
লেহ্	34° N	34°N	3506												

৪) এখন খুঁজে বের করো :

ক) জুলাই মাসের তুলনায় জুন মাসে তিরুবনন্তপূরম এবং শিলং-এ বেশি বৃষ্টিপাত হয় কেন ?

খ) জুলাই মাসে তিরুবনন্তপূরমের তুলনায় মুম্বাই-এ বেশি বৃষ্টিপাত হয় কেন ?

গ) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে চেন্নাইয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় কেন ?

ঘ) কলকাতার তুলনায় শিলং-এ বেশি বৃষ্টিপাত হয় কেন ?

ঙ) জুন মাসের তুলনায় জুলাই মাসে কলকাতায় বেশি বৃষ্টিপাত হয় অন্যদিকে শিলং-এ জুলাই মাসের তুলনায় জুন মাসে বেশি বৃষ্টিপাত হয় কেন ?

চ) যোধপুরের তুলনায় দিল্লিতে বেশি বৃষ্টিপাত হয় কেন ?

৫) কারণ দেখাও :-

— তিরুবনন্তপূরমের জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

— ভারতের প্রায় সমগ্র অংশের তুলনায় মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমনকালে শুধুমাত্র চেন্নাই-এ বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

— যোধপুর-এর জলবায়ু উষ্ণ মরু প্রকৃতির।

— প্রায় সারাবছর ধরে লেহ্‌তে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়।

— দিল্লি এবং যোধপুরে প্রায় তিনমাস অধিক বৃষ্টিপাত হয়, যেখানে তিরুবনন্তপূরম এবং শিলং-এ বছরের প্রায় ৯ মাস বৃষ্টিপাত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, এইসব গঠনাবলি ছাড়াও সারাদেশের জলবায়ুকাঠামো সঠিক রাখার ক্ষেত্রে মৌসুমিবায়ু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী
(Natural Vegetationand Wildlife)

৫

তোমরা নিশ্চয় তোমাদের স্কুল বা বাড়ির চারপাশে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, ঝোপঝাড়, ঘাস, লতাপাতা, পশুপাখি দেখেছ। এইগুলো একই প্রজাতির না বৈচিত্র্যময় ? ভারত একটি বিশাল দেশ। তাই বিভিন্ন প্রকার জৈব বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

পৃথিবীর বারোটি বৃহৎ জৈব বৈচিত্র্যের দেশের মধ্যে ভারত একটি। প্রায় ৪৭,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের উপস্থিতি পৃথিবীতে ভারতকে দশম এবং এশিয়াতে চতুর্থ স্থান প্রদান করেছে। প্রায় ১৫,০০০ প্রজাতির ফুলগাছ রয়েছে ভারতে, যা পৃথিবীর মোট ফুল প্রদানকারী উদ্ভিদের ৬% । এছাড়া ফুল প্রদান করে না এমন গাছ যেমন— **ফার্ন, শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ, ছত্রাক** প্রভৃতি উদ্ভিদও পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। ভারতে প্রায় ৯০,০০০ প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। সমুদ্রজল ও স্বাদু জলে বিভিন্ন প্রজাতির মৎস দ্বারা ভারত সমৃদ্ধ।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলতে সেই উদ্ভিদজগৎকে বোঝায় যেগুলো মানুষের সাহায্য ও প্রচেষ্টা ছাড়া প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে জন্মায় ও বেড়ে ওঠে এবং সুদীর্ঘকাল মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে। তাই উৎপাদিত ফসল, ফলচাষ, ফুলবাগিচা প্রভৃতি উদ্ভিদ হলেও স্বাভাবিক উদ্ভিদ নয়।

ফ্লোরা (Flora) বা উদ্ভিদকূল বলতে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ সময়কালের উদ্ভিদকে বোঝায়। অনুরূপভাবে ফনা (Fauna) বা প্রাণীকুল হল কোনো বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ সময়কালেরপ্রাণীকুল। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের এই বৈচিত্র্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভরশীল।

জান কি ? দেশজ বা স্থানীয় যেসকল উদ্ভিদ আপনা-আপনি জন্মায় তাদেরকে বিশুদ্ধ স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে, কিন্তু যেসকল উদ্ভিদ ভারতের বাইরে জন্মায় তাদেরকে বিদেশাগত স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে।

১) ভূ-প্রকৃতি (Relief) :

অ) ভূমিরূপ (Land) : ভূমিরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাভাবিক উদ্ভিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তুমি কি পর্বত, মালভূমি ও সমতলভূমি বা শুষ্ক ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে একই প্রজাতির উদ্ভিদ দেখতে পাবে ? ভূমিরূপের জন্যই স্বাভাবিক উদ্ভিদে বৈচিত্র্য দেখা যায়। সাধারণত উর্বর মাটি কৃষিকাজের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। তরঙ্গায়িত ও বৃক্ষ ভূমিতে তৃণভূমি ও অরণ্যভূমি প্রাধান্য লাভ করে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী বাস করে।

আ) মৃত্তিকা (Soil) :

স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মৃত্তিকা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মায়। যেমন- বালিময় মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রজাতির মরু উদ্ভিদ ক্যাকটাস, ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ প্রভৃতি জন্মায়। অপরদিকে আর্দ্র অঞ্চলে জলজ উদ্ভিদ, ব-দ্বীপ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বা ব-দ্বীপ অরণ্য দেখা যায়। পর্বতের পাদদেশে মাটির গভীরতা অনুযায়ী সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায়।

২) জলবায়ু (Climate) :

ক) উত্তাপ (Temperature) : বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত এবং মৃত্তিকার ওপর স্বাভাবিক উদ্ভিদের বিস্তৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে। হিমালয়ের ঢালে এবং উপদ্বীপীয় উচ্চভূমির উচ্চতা যেখানে ৯১৫ মি অপেক্ষা বেশি সেখানে তাপমাত্রা কম থাকে। ফলে উদ্ভিদের প্রকারভেদ ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় এবং সেই অনুসারে ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় বা পার্বত্য অরণ্য দেখা যায়।

তাপমাত্রা অনুযায়ী স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল (Temperature Characteristic of the Vegetation Zones)

স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল	বার্ষিক গড় তাপমাত্রা (সে.)	জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা (সে.)	মন্তব্য
ক্রান্তীয়	২৪° সে. এর বেশি	১৮° সে. এর বেশি	তুষারহীন
উপক্রান্তীয়	১৭° সে. থেকে ২৪° সে.	১০° সে. থেকে ১৮° সে.	বিরল তুষারপাত
নাতিশীতোষ্ণ	৭° সে. থেকে ১৭° সে.	-১° সে: থেকে -১০° সে:	তুষারপাতের সাথে কিছু বরফ
পার্বত্য	৭° সে. এর কম	-১° সে. এর কম	বরফময়

উৎস : ভারতের পরিবেশ মানচিত্র জুন ২০০১, কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, দিল্লি
(Environment Atlas of India, June 2001, Central Pollution Control Board, Delhi)

খ) সূর্যালোক (Sunlight) :
অক্ষাংশ ও ভূমির উচ্চতার উপর সূর্যালোকের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সূর্যালোকের স্থায়িত্বের ওপর ঋতু ও দিনের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালে দিন দীর্ঘ বলে সূর্যালোক বেশি পাওয়া যায় এবং গাছপালা তুলনামূলকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

বের করো : হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে উত্তর ঢালের তুলনায় ঘন অরণ্যাবৃত অঞ্চল দেখা যায় কেন ?

ই) বৃষ্টিপাত (Rainfall) : ভারতের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) আগমন এবং উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমনের ফলে ঘটে। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে গভীর অরণ্য দেখা গেলেও কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে হালকা বা মাঝারি অরণ্য দেখা যায়।

নিজে করো : পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমঢাল ঘন অরণ্যাবৃত হলেও পূর্বঢাল ততটা অরণ্যাবৃত নয় কেন ?

তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ মানবজীবনে অরণ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ? বনভূমি হল পুনর্ভব সম্পদ এবং পরিবেশের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় জলবায়ু, ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ, জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে বনভূমির অবদান অনস্বীকার্য, এছাড়া বিভিন্ন বনজভিত্তিক শিল্প কারখানার প্রয়োজনীয় উপাদানও বনভূমি থেকে সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বনভূমি। বনভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দৃশ্যপট, মনোরম জলবায়ু প্রভৃতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হওয়ায় পর্যটন কেন্দ্রও গড়ে ওঠে। এটি তাপমাত্রা ও বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে। বনভূমি অঞ্চলে হিউমাস মৃত্তিকা দেখা যায়। বর্তমানে কৃষিজমির ক্রমবর্ধমান চাহিদা, শিল্পোন্নতি, খনিজতোলন, নগরায়ণ সর্বোপরি অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ প্রভৃতি কাজের ফলে ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

কাজ
তোমার বিদ্যালয় বা এলাকাতে বনমহোৎসব পালন করো। কিছু গাছ সংগ্রহ করো এবং তাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করো।

ভারতের বিশাল অংশ জুড়ে বনভূমি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক উদ্ভিদের পরিমাণ খুবই কম। হিমালয়ের কিছু দুর্গম অঞ্চল, মধ্য ভারতের উচ্চভূমি এবং মরুস্থলী ছাড়া প্রায় অধিকাংশ স্থানের স্বাভাবিক উদ্ভিদই পরিবেশের পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা মানুষের আগ্রাসীর চাহিদার ফলে ধ্বংস হচ্ছে।

কাজ
প্রদত্ত স্তম্ভচিত্রটি (চিত্র-৫.১) লক্ষ করো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও—
অ) যেসকল রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অরণ্যাবৃত তাদের নাম লেখো।
আ) যেসকল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ কম তাদের নাম লেখো এবং ওই অঞ্চলে বনভূমি কম কেন ?

জান কি ? ২০১১ সালের ভারতের রাজ্যগুলোর বনভূমি সংক্রান্ত তথ্য (Indias State Forest Report, 2011) অনুযায়ী ভারতে অরণ্যাবৃত ভূমির পরিমাণ **২১·০৫ শতাংশ**। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে কোনো দেশে অন্তত **৩৩ শতাংশ** ভূমি অরণ্যাবৃত থাকা প্রয়োজন।

বাস্তুতন্ত্র (Eco System) : সমপ্রকৃতির জলবায়ু অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মায়। বনভূমির প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্তন হলে বন্যপ্রাণীও পরিবর্তিত হয়। অতএব প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর

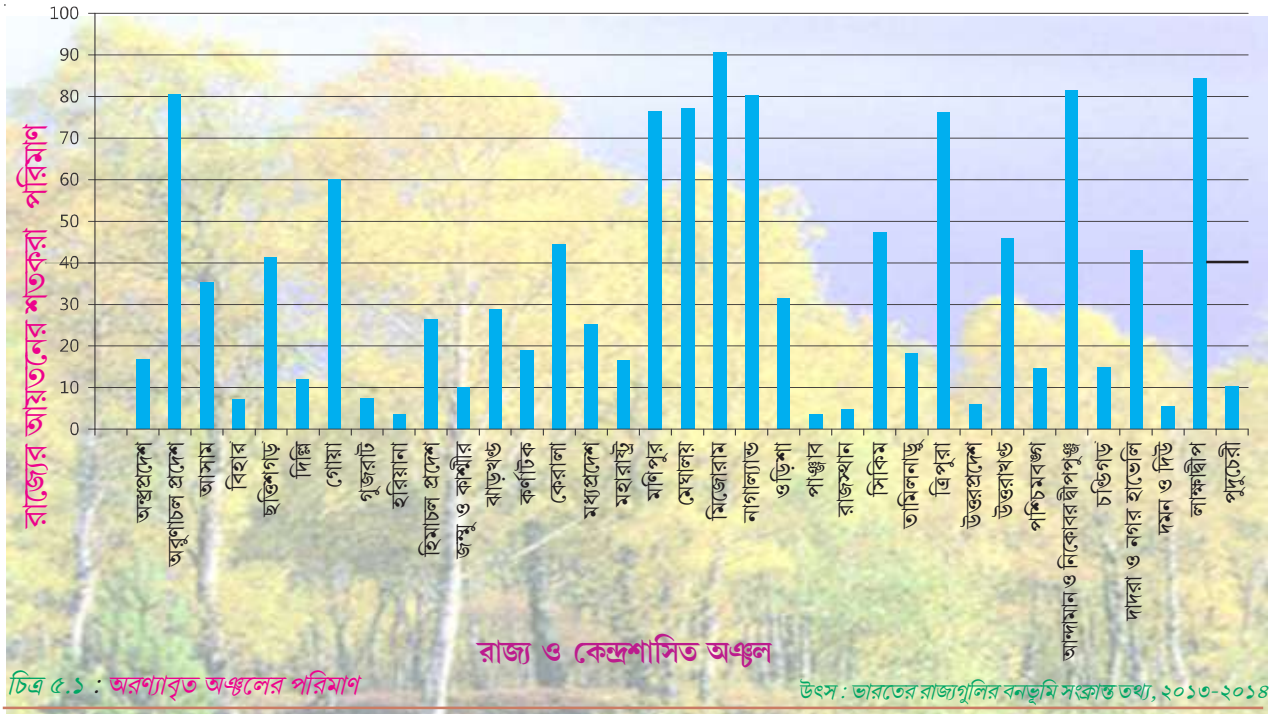

চিত্র ৫.১ : অরণ্যাবৃত অঞ্চলের পরিমাণ

উৎস : ভারতের রাজ্যগুলির বনভূমি সংক্রান্ত তথ্য, ২০১৩-২০১৪

উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর জীবনযাত্রা পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত। এর উপর ভিত্তি করেই বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয়। বাস্তুতন্ত্র গঠনে মানুষেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মানুষদের দ্বারা কীভাবে বাস্তুতন্ত্র প্রভাবিত হয় ? মানুষ উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীকে তাদের বিভিন্ন কাজে লাগায়। মানুষের চাহিদার ফলে এই সকল সম্পদের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা বৃক্ষচ্ছেদন করে বনভূমি ধ্বংস করছে এবং বন্যপ্রাণী হত্যা করছে। ফলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ফলস্বরূপ বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্তির পথে।

তুমি কি জান যে, নির্দিষ্ট উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ বিশাল বাস্তুতন্ত্রকে বায়োম (Biome) বলে। বায়োম সাধারণত উদ্ভিদকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ (Types of Vegetation) : ভারতে যেসকল স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখা যায় তাদেরকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় (চিত্র ৫.৩)—

ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য (Tropical Evergreen Forest)
খ) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য (Tropical Deciduous Forest)
গ) ক্রান্তীয় কাঁটা ও ঝোপজাতীয় অরণ্য (Thron Forests and Scrubs)
ঘ) পার্বত্য অরণ্য (Montane Forest)
ঙ) উপকূলীয় অরণ্য (Mangrove Forest)

ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য (Tropical Evergreen Forest) : পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিবহুল অঞ্চল এবং লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, আসামের উত্তরাংশ, তামিলনাড়ু উপকূল প্রভৃতি স্থানে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি (চিত্র ৫.২) দেখা যায়। যে সকল

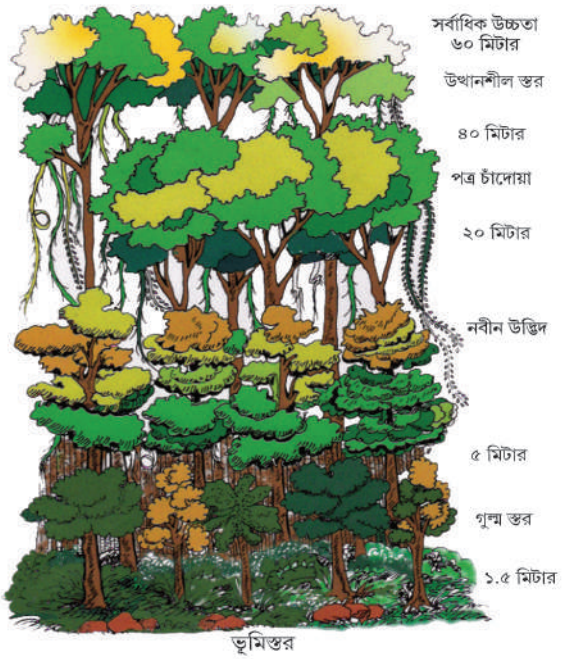

চিত্র ৫.২ : ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি

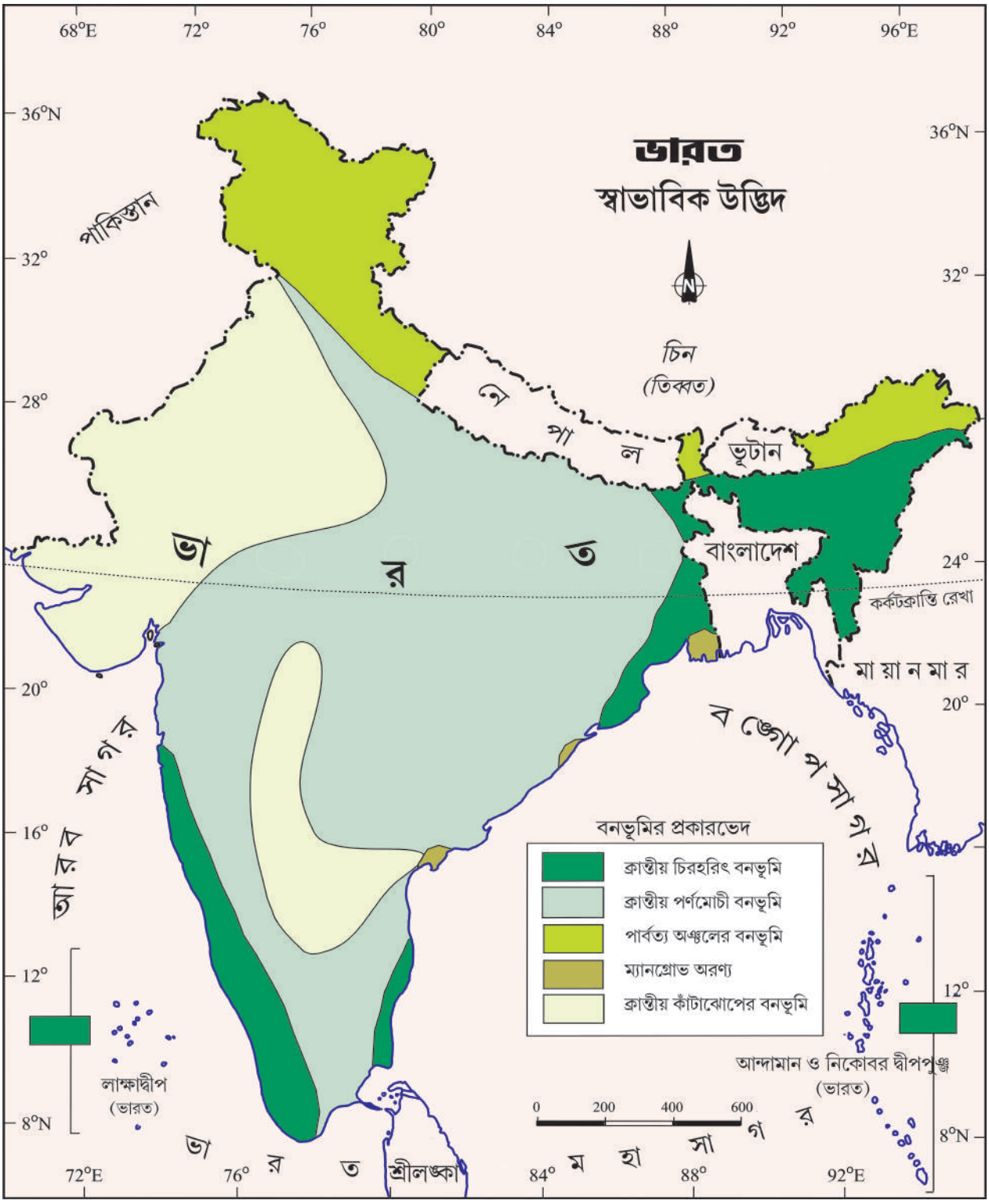

চিত্র ৫.৩ : স্বাভাবিক উদ্ভিদ

মানচিত্রটি অধ্যয়ন করে বের করো কেন কিছু রাজ্যে অন্য রাজ্যের তুলনায় স্বাভাবিক উদ্ভিদের ঘনত্ব বেশি ?

অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত **২০০ সেমি-র** বেশি ও স্বল্পস্থায়ী **শুষ্ক** ঋতু, সে সমস্ত অঞ্চল এই বনভূমির পক্ষে আদর্শ। বৃক্ষগুলো **৬০ মিটার** বা তার চেয়ে বেশি দীর্ঘ হয়। সারাবছর উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু থাকায় এখানে বৃক্ষ, ঝোপঝাড়, গুল্ম প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য বৃক্ষগুলো থেকে পাতা ঝরার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। এইজন্য এই জাতীয় বনভূমিতে সারাবছর সবুজ পাতা দেখা যায়। তাই এগুলো চিরহরিৎ বনভূমি নামেপরিচিত।

মূল্যবান বৃক্ষসমূহ - এই বনভূমি অঞ্চলের কয়েকটি অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ হল **ইবনি, মেহগনি, রোজউড, রাবার, সিঙ্কোনা** প্রভৃতি।

বন্যপ্রাণী - **হাতি, লেমুর (লেঙ্গুর), বানর, হরিণ** প্রভৃতি এই বনভূমির প্রধান বন্যপ্রাণী। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গালে এক শিং বিশিষ্ট গন্ডার দেখা যায়। এছাড়া, প্রচুর সংখ্যক **পাখি, বাদুড়, স্লথ, কাঁকড়াবিছা, শামুক** প্রভৃতিও এই বনভূমিতে দেখা যায়।

খ) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমি (Tropical Deciduous Forest) : ভারতের অধিকাংশ বনভূমি ক্রান্তীয় পর্ণমোচী প্রকৃতির, এই বনভূমি **মৌসুমি অরণ্য** নামেও পরিচিত, যেসকল অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৭০-২০০ সেমি এবং তাপমাত্রা **১৫°** - **২৬°** সে. সেখানে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমি দেখা যায় (চিত্র ৫.৪) । শুষ্ক ঋতুতে ছয় থেকে আট সপ্তাহের জন্য বৃক্ষগুলো থেকে পাতা ঝরে যায়।

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমিকে আর্দ্র পর্ণমোচী এবং শুষ্ক পর্ণমোচী — এই দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

আর্দ্র পর্ণমোচী : যেসমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত **১০০-২০০** সেমি-র মধ্যে থাকে সেখানে আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। সাধারনত ভারতের পূর্বদিকে, হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তর-পূর্বের রাজ্যসমূহ, হিমালয়ের পাদদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার পশ্চিম দিক ও ছত্তিশগড়, পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বঢাল প্রভৃতি স্থানে ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বনভূমি দেখা যায়।

মূল্যবান বৃক্ষ - বনভূমির মূল্যবান বৃক্ষ হল **সেগুন**। এছাড়া **শাল, বাঁশ, শিশু, চন্দন, অর্জুন, খয়ের, কুসুম, তুঁতগাছ এবং মশলা** প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

শুষ্ক পর্ণমোচী - যেসমস্ত অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৭০ - ১০০ সেমি-র মধ্যে থাকে সেখানে ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী বনভূমি দেখা যায়। উপদ্বীপীয় মালভূমির বৃষ্টিবহুল অঞ্চল এবং বিহার ও

চিত্র ৫.৪ : ক্রান্তীয় পর্ণমোচী উদ্ভিদ

উত্তর প্রদেশের সমভূমি অঞ্চলে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমি দেখা যায়।

মূল্যবান বৃক্ষ - এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে **শাল, সেগুন, আম, জাম, বট, নিম** প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মায়। এই বনভূমির বিস্তীর্ণ অংশ কৃষিকাজের জন্য পরিষ্কার করা হয়েছে এবং কিছু অংশে গোচারণ করা হয়।

বন্যপ্রাণী - এই বনভূমিতে সাধারণত **হাতি, বাঘ, সিংহ, শূকর, হরিণ** প্রভৃতি বন্যপ্রাণী দেখা যায়। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির **পাখি, টিকটিকি, সরীসৃপ, কচ্ছপ** প্রভৃতি প্রাণী।

গ) কাঁটা ও ঝোপজাতীয় অরণ্য (Thron Forests and Scrubs) : যে সমস্ত অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত **৭০সেমি**-র কম সেখানে কাঁটাযুক্ত ও ঝোপজাতীয় অরণ্য দেখা যায়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ সাধারণত গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যের শুষ্ক অংশে এই জাতীয় বনভূমি দেখা যায়। (চিত্র ৫.৫)

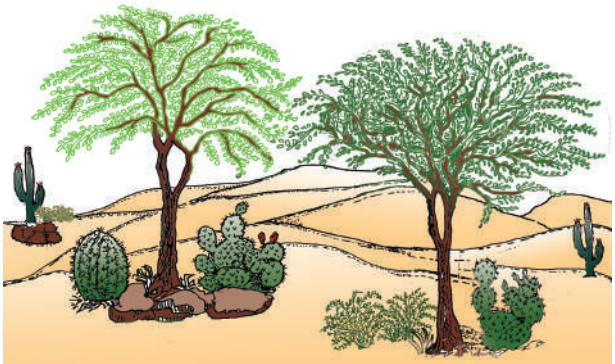

চিত্র ৫.৫ : কাঁটা ও ঝোঁপ জাতীয় অরণ্য

প্রধান উদ্ভিদ - **অ্যাকাসিয়া, তালজাতীয় বৃক্ষ, ক্যাকটাস, বাবলা, ফনীমনসা** প্রভৃতি এখানকার প্রধান উদ্ভিদ। উদ্ভিদগুলো বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। জলের সন্ধানে গাছগুলোর শিকড় মাটি থেকে অনেক গভীরে প্রবেশ করে। জল সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষগুলোর কাণ্ড কাঁটা ও মোমজাতীয় পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। বাষ্পীভবন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাতাগুলো পুরু ও ছোটো হয়। মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের এরূপ উদ্ভিদকে জেরোফাইট বলে।

বন্যপ্রাণী - এই বনভূমিতে সাধারণত **ইঁদুর, খরগোস, শৃগাল, নেকড়ে বাঘ, বাঘ, সিংহ, বুনো গাধা, ঘোড়া এবং উট** দেখা যায়।

ঘ) পার্বত্য বনভূমি (Montane Forest) : পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উষ্ণতা হ্রাস পাওয়ায় স্বাভাবিক উদ্ভিদেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও ক্রান্তীয় অরণ্য থেকে তুন্দ্রা অরণ্য দেখতে পাই। সাধারণত **১০০০-২০০০ মিটার** উচ্চতায় আর্দ্র ক্রান্তীয় অরণ্য দেখা যায়। ওক্, কাঠবাদাম প্রভৃতি বৃহৎ পত্রযুক্ত চিরহরিৎ উদ্ভিদ এখানে বিরাজমান। ক্রান্তীয় অরণ্যের **১৫০০-৩০০০ মিটার** উচ্চতায় **পাইন, রুপালি ফার, স্প্রুস, দেবদারু, সিভার** প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায়। হিমালয়ের দক্ষিণ ঢাল, দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ভারতের উচ্চতম স্থানসমূহের অধিকাংশই এই জাতীয় বনভূমি দ্বারা আবৃত। উচ্চতাভেদে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি দেখা যায়। অধিক উচ্চতায় সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে **৩৬০০ মিটারের** বেশি উচ্চতায় নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি ও তৃণভূমি এবং আল্পীয় অরণ্য বিরাজমান। **পাইন, রুপালি ফার, জুনিপার, বার্চ** প্রভৃতি এই অরণ্যের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। তারও ওপরে আছে হিমরেখা। বৃক্ষ সেখানে অদৃশ্য হয়ে ঝোপঝাড় জাতীয় উদ্ভিদ এবং অবশেষে আল্পীয়

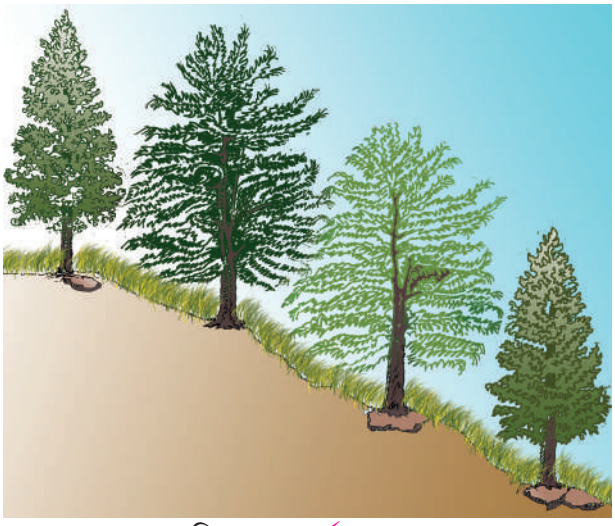

চিত্র ৫.৬ : পার্বত্য অরণ্য

তৃণভূমি শুরু হয়। এই তৃণভূমিতে যাযাবর আদিবাসি গুজ্জর, বাকারওয়াল প্রভৃতি জনজাতি পশুচারণ করে। তারও উচ্চতম স্থানে **শৈবাল জাতীয় তুন্দ্রা উদ্ভিদ** দেখা যায়।

বন্যপ্রাণী - হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে **কাশ্মীরি হরিণ, তিলকিত (Spotted) হরিণ, বুনো মেষ, খরগোশ, তিব্বতীয় কৃষ্ণসারমৃগ, চমরি গাই (Yak), তুষার চিতা, কাঠবেড়ালি, লম্বা শিংযুক্ত বুনো ছাগল, ভাল্লুক এবং বিরল প্রজাতির লাল পান্ডা, ভেড়া এবং পুরু ও দীর্ঘ পশমযুক্ত ছাগল** দেখা যায়।

ঙ) উপকূলীয় অরণ্য (Mangrove Forest) : জোয়ারভাটা দ্বারা প্রভাবিত উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ত মাটিতে ম্যানগ্রোভ বা উপকূলীয় অরণ্য দেখা যায়। কাদামাটি ও পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে এই ধরনের উপকূল গঠিত হয়েছে। এই অরণ্যের বৃক্ষসমূহ লবণাক্ত জলে শ্বাসমূলের সাহায্যে শ্বাসগ্রহণ করে এবং নরম মাটি ও জোয়ারভাটার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঠেস মূলের সাহায্যে দাঁড়িয়ে

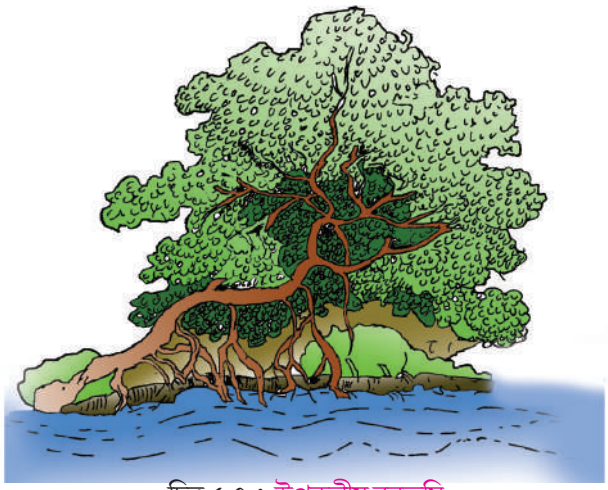

চিত্র ৫.৭ : উপকূলীয় বনভূমি

থাকে। সাধারণত গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীসমূহের ব-দ্বীপ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ জাতীয় অরণ্য দেখা যায়। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ **সুন্দরী** বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত। সুন্দরী বৃক্ষের কাঠ খুব শক্ত এবং আসবাব তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রয়েছে **তাল ও নারকেল জাতীয় বৃক্ষ, কেওড়া, আগর** প্রভৃতি।

বন্যপ্রাণী - **রয়েল বেঙ্গল টাইগার** এই বনভূমির বিখ্যাত পশু। তাছাড়া **কচ্ছপ, কুমির, ঘরিয়াল** এবং বিভিন্ন ধরনের **সাপ ও হরিণ** এই বনভূমিতে দেখা যায়।

আলোচনা করো - *পৃথিবী থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী নিশ্চিহ্ন হলে কী হবে ? মানুষ কি এই ধরনের পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকতে পারবে ? জীব বৈচিত্র্য কেন প্রয়োজন এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন ?*

ঔষধি গাছ (Medicinal Plants)

প্রাচীন কাল থেকেই ভারত ঔষধি গাছ ও মশলা জাতীয় উদ্ভিদের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রায় ২০০০টি প্রজাতির উদ্ভিদের উল্লেখ রয়েছে। কমপক্ষে ৫০০টি প্রজাতির উদ্ভিদ প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা হয়। (The World Conservation Union) ৩৫২ প্রজাতির উদ্ভিদকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যার ৫২টি প্রজাতির উদ্ভিদ মাত্রাতিরিক্ত বিপন্ন এবং ৪৯টি প্রজাতীর ঔষধি গাছ বিপদসীমায় রয়েছে। ভারতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ঔষধি গাছগুলো হল --

সর্পগন্ধা	:	রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি একমাত্র ভারতেই পাওয়া যায়।
জাম	:	পাকা ফলের রস ভিনিগার প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হয়। এটি বায়ুরোগ নিরাময় করে এবং মূত্রবর্ধক, খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। ফলের বীজ বহুমূত্র রোগ (Diabetics) নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।
অর্জুন	:	এই গাছের পাতার রস কানের ব্যাথা নিরাময় করে। এটি রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।
বাবলা	:	এই গাছের পাতা দিয়ে চোখের কালশিটে জনিত সমস্যা দূর করার ঔষধ তৈরি করা হয়। এছাড়া এই গাছের আঠা দিয়ে বলবর্ধক ঔষধ তৈরি করা হয়।
নিম	:	এটি অতিমাত্রায় জীবাণুনাশক এবং ব্যাকটেরিয়ানাশক।
তুলসী	:	সর্দি-কাশির প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।
কাচনার	:	এটি শ্বাসকষ্ট এবং সপূয ক্ষত (Ulcer) রোধে ব্যবহার করা হয়। এর অঙ্কুর ও মূল পাচক সমস্যার অব্যর্থ প্রতিষেধক।

তোমার এলাকার কিছু ঔষধি গাছ খুঁজে বের করো। স্থানীয় জনগণের রোগ নিরাময়ে এই ধরনের গাছ কীভাবে ব্যবহার করবে ?

উৎস : ঔষধি গাছ, লেখক- ড: এস কে জৈন, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৯৪, (National Book Trust of India)

কাজ

চিত্রে যে উদ্ভিদগুলোকে দেখানো হয়েছে তা চিহ্নিত করো। এই উদ্ভিদগুলোর সঙ্গে তোমার অঞ্চলের উদ্ভিদের কী কী মিল ও অমিল আছে ?

বন্যজীবন ও বন্যপ্রাণী (Wild Life) :

শুধু উদ্ভিদই নয় প্রাণীবৈচিত্র্যেও ভারত সমৃদ্ধ। এখানে প্রায় **৯০,০০০** প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। প্রায় **২০০০** প্রজাতির পাখি রয়েছে, যা পৃথিবীর মোট পাখির **১৩ শতাংশ**। ভারতে ২৫৪৬ প্রজাতির মাছ রয়েছে যা পৃথিবীর মোট সঞ্চয়ের প্রায় **১২ শতাংশ**। পৃথিবীর মোট উভচর, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রায় **৫ শতাংশ** থেকে **৮ শতাংশ** ভারতে রয়েছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে হাতি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। *আসাম, কর্ণাটক, কেরালা* প্রভৃতি রাজ্যে উষ্ণ আর্দ্র বনভূমিতে হাতি দেখা যায়। এছাড়া *আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে* জলাভূমি ও জলাভূমি সংলগ্ন নিম্নভূমিতে এক শিং বিশিষ্ট গন্ডার দেখা যায়। *কচ্ছের রণ*-এর শুষ্ক অঞ্চল এবং *থর মরুভূমির* **বুনো গাধা ও উটের** আবাসস্থল। এছাড়া ভারতীয় **বুনোমোষ (Bison), নীলগাই (নীলষাঁড়), চৌশিঙ্গা (চার শিং বিশিষ্ট কৃষ্ণসার মৃগ), বক্রশিংবিশিষ্ট হরিণ (Gazel)** সহ বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ ও অন্যান্য জন্তু ভারতে পাওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির বানরও দেখা যায়।

জান কি ? ভারতে ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়িত হয়।

ভারত হল পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে বাঘ এবং সিংহ একসাথে পাওয়া যায়। গুজরাটের গির অরণ্য সিংহের প্রাকৃতিক আবাসস্থল। মধ্যপ্রদেশের বনাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এবং হিমালয় অঞ্চলে বাঘ দেখা যায়। চিতাবাঘ হল বিড়াল প্রজাতির প্রাণী, তবে তারা শিকারের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। (চিত্র ৫.৮)

জান কি ?

এশিয়ার বংশোদ্ভূত সিংহদের জন্য গির অরণ্য একমাত্র প্রাকৃতিক আবাসস্থল।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জন্তুসমূহ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, এরা অত্যন্ত ঠান্ডা জলবায়ুতে বেঁচে থাকে। লাদাখের উচ্চতম স্থান, যেখানে বরফ পরে সেখানে **চমরি গাই, এক টনের মতো ওজনবিশিষ্ট রোমশ বুনো বৃষ, তিব্বতীয় কৃষ্ণসার মৃগ, ভারাল (নীল মেষ), বুনো মেষ এবং কিয়াঙ (তিব্বতীয় বুনো গাধা)** প্রভৃতির আবাসস্থল। এগুলো ছাড়াও **বুনো ছাগল, ভাল্লুক, তুষারচিতা এবং** অত্যন্ত বিরল প্রজাতির **লাল পান্ডা,** লুক্কায়িত রয়েছে।

চিত্র ৫.৮ : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

নদী, হ্রদ ও উপকূলীয় অঞ্চলে **কচ্ছপ, কুমির** ও **ঘড়িয়াল** দেখা যায়। বর্তমানে ভারতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রজাতির কুমির দেখা যায়।

ভারতে বিভিন্ন রং ও প্রজাতির পাখি দেখা যায়। ভারতের জলাভূমি ও বনভূমিতে **ময়ূর**, বিভিন্ন রঙিন **পাখি, হাঁস, টিয়া, সারস, পায়রা** প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যায়।

জৈববৈচিত্র্য অনুসারে আমরা আমাদের খাদ্য নির্বাচন ও সংরক্ষণ করি। আমরা বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে ঔষধি গাছ নির্বাচন করি। পশুদেরকে আমরা শুধু দুধের জন্যই পালন করি না, ভারবহনে, পরিবহণে, মাংস ও ডিমের চাহিদা পূরণের জন্য এদের প্রতিপালন করা হয়। মাছ প্রোটিন সরবরাহ করে। কিছু কিছু কীটপতঙ্গ শস্য ও ফুলে পরাগ সংযোগ করে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে, আবার কিছু অপকারী কীটপতঙ্গও রয়েছে। তবে বাস্তুতন্ত্রে এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ অবদান রয়েছে বলে এদের সংরক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মানুষের দ্বারা বন ও বণ্যপ্রাণী ধ্বংসের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রায় ১৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্তির পথে এবং ২০ প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিছু প্রজাতির প্রাণীও বিলুপ্ত হয়েছে এবং কিছু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার প্রধান কারণগুলো হল —

ক) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কিছু লোভী শিকারিদের ক্রমাগত শিকারের ফলে প্রকৃতি এক ভয়ঙ্কর হুমকি বা বিপদের সম্মুখীন।

খ) মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ ও শিল্পকারখানার বর্জ্য পদার্থসমূহ নিক্ষেপণ।

গ) বিদেশি দ্রব্যের অতি প্রয়োগ বা নতুন নতুন দ্রব্য উদ্ভাবন।

ঘ) চাষাবাদ ও বসতিস্থাপনের জন্য বৃক্ষচ্ছেদন করা।

ঙ) সর্বোপরি, পরিবেশে আন্ত্রিক সঞ্চয়ের কারণে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হবার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিদজগতকে রক্ষা করা প্রয়োজন। তাই ভারত সরকার প্রাণী ও উদ্ভিদকূলকে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিয়েছে —

অ) উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলকে রক্ষা করার জন্য সারা দেশে ১৪টি জীবমণ্ডল সংরক্ষণালয় (Biosphere Reserve) তৈরি করা হয়েছে। এদের প্রধান চারটি হল — পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, উত্তরাখণ্ডের নন্দাদেবী, তামিলনাড়ুর মান্নার উপকূল এবং কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ুর নীলগিরি। পৃথিবীতে যতগুলো জীবমণ্ডল সংরক্ষণালয় রয়েছে তাদের সাথে ভারতের এই চারটিও যুক্ত রয়েছে।

কাজ

ক) ওপরের পত্রিকাংশে চিহ্নিত সংবাদসমূহ বের করো।

খ) পত্রিকা, ম্যাগাজিন থেকে বিভিন্ন বিপন্ন প্রাণীর নাম সংগ্রহ করো।

গ) এদের রক্ষা করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ লেখো।

ঘ) বন্যপ্রাণী ও পাখি সংরক্ষণে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে ?

পরিযায়ী পাখি (Migratory Birds)

ভারতের কিছু কিছু জলাভূমি পরিযায়ী পাখিদের জন্য বিখ্যাত। শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে বিপুল সংখ্যক সারস পাখি আসে। পরিযায়ী পাখিদের জন্য অপর বিখ্যাত জলাভূমি হল কচ্ছের রণ। মরুভূমি যেখানে সমুদ্রের সাথে মিশেছে, সেখানে উজ্জ্বল গোলাপি পালকযুক্ত হাজার হাজার রাজহাঁস আসে এবং লবণাক্ত মাটিতে বাসা বানিয়ে শিশু শাবককে বড়ো করে। এটা ভারতের অনন্য সুন্দর দৃশ্য। এ দেশ কি প্রাকৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নয় ?

জীবমণ্ডল সংরক্ষণালয়

১) সুন্দরবন	২) মান্নার উপসাগর
৩) সিমলিপাল	৪) দিহং-দিবং
৫) নীলগিরি	৬) ডিব্রু সৈখোয়া
৭) নন্দাদেবী	৮) অগস্থ্যমালাই
৯) নোকরেক	১০) কাঞ্চনঝঙ্ঘা
১১) বৃহৎ নিকোবর	১২) পাচমারি
১৩) মানস	১৪) অচানকমার-অমরকণ্টক
১৫) কচ্ছ	১৬) শীতল মরুভূমি
১৭) সেশাচলম	১৮) পান্না

আ) উদ্ভিদ বিদ্যাসম্বন্ধীয় উদ্যান (Botanical Garden) এর জন্য ১৯৯২ সাল থেকে সরকার আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দিয়ে আসছে।

ই) ব্যাঘ্র প্রকল্প, গন্ডার প্রকল্প, ভারতীয় পক্ষীপ্রকল্পসহ পরিবেশ উন্নয়নকারী বিভিন্ন প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে

ঈ) প্রাকৃতিক এই ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য সরকার সারা দেশে ১০৩টি জাতীয় উদ্যান, ৫৩৫টি অভয়ারণ্য এবং জীববিদ্যা সম্বন্ধীয় উদ্যান (Zoological Garden) গড়ে তুলেছে।

আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। নির্বিচারে বন ধ্বংস হলে আমাদের ধ্বংসও অনিবার্য।

অনুশীলনী

১) সঠিক উত্তরটি বাছাই করো —

ক) রাবার কী জাতীয় স্বাভাবিক উদ্ভিদ—

অ) তুন্দ্রা — আ) হিমালয় পার্বত্যাঞ্চল

ই) উপকূলীয় — ঈ) ক্রান্তীয়

খ) কত সেমি-র অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সিঙ্কোনা গাছ জন্মায় —

অ) ১০০ সেমি. — আ) ৭০ সেমি.

ই) ৫০ সেমি. — ঈ) ৫০ সেমি-র কম।

গ) সিমলিপাল জীবসংরক্ষণাগার নিম্নলিখিত কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?

অ) পাঞ্জাব — আ) দিল্লি

ই) ওড়িশা — ঈ) পশ্চিমবঙ্গ।

ঘ) নিম্নে প্রদত্ত ভারতের কোন্ জীব সংরক্ষণাগারটি পৃথিবীর জীবসংরক্ষণাগারের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় —

অ) মানস — আ) মান্নার উপসাগর

ই) নীলগিরি — ঈ) নন্দাদেবী।

২) নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও —

ক) বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও।

খ) ভারতের উদ্ভিদ ও প্রাণীবিন্যাসের জন্য কোন্ কোন্ উপাদানগুলো দায়ী?

গ) জীবমণ্ডল বা প্রাণী সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ। দুটো উদাহরণ দাও।

ঘ) ক্রান্তীয় অঞ্চলে বসবাসকারী দুটো প্রাণীর নাম লেখো এবং পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিদসমূহের বিবরণ দাও।

৩) পার্থক্য করো —

ক) ফ্লোরা এবং ফনা। (Flora and Fauna)

খ) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ও পর্ণমোচী অরণ্য।

৪) ভারতের বিভিন্ন প্রকার স্বাভাবিক উদ্ভিদের নাম লেখো এবং পার্বত্য অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের বিবরণ দাও।

৫) ভারতের বেশ কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন বিপন্ন কেন?

৬) প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা সমৃদ্ধ কেন?

মানচিত্র দক্ষতা –

ভারতের রেখামানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দেখাও —

ক) চিরহরিৎ বনভূমি।

খ) শুষ্ক পর্ণমোচী বনভুমি।

গ) উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের দুটো করে জাতীয় উদ্যান।

প্রকল্প (Project/Activity)

ক) তোমার চারপাশের কিছু ঔষধিগাছ খুঁজে বের করো।

খ) বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণীকে ভিত্তি করে মানুষের দশটি জীবিকা প্রণালীর নাম লেখো।

গ) বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে কবিতা বা অনুচ্ছেদ লেখো।

ঘ) বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পথনাটক রচনা করো এবং তোমার এলাকাতে উপস্থাপন করো।

ঙ) তোমার বা তোমার পরিবারের কোনো সদস্যের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গাছ লাগাও। গাছটির বৃদ্ধি লক্ষ করো এবং কোন্ ঋতুতে দ্রুত বৃদ্ধি পায় তা লক্ষ করো।

৬

জনসংখ্যা
(Population)

তোমরা কি জনমানবহীন পৃথিবীর কল্পনা করতে পারো ? তবে কারা এই সম্পদের ব্যবহার করত বা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশই বা কীভাবে সৃষ্টি হত? কোনো দেশের আর্থসামাজিক উন্নতিতে জনসাধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসাধারণই সম্পদ উৎপাদন করে এবং নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে উৎপাদিত সম্পদের ব্যবহার করে। মানুষ তার উদ্ভাবনী ও কারিগরি দক্ষতা দ্বারা কয়লাকে সম্পদে পরিণত করার পূর্ব পর্যন্ত কয়লাকে শুধুমাত্র পাথর বলে গণ্য করা হত। প্রাকৃতিক ঘটনাবলি যেমন, বন্যা বা সুনামি তখনই 'বিপর্যয়'-রূপে পরিগণিত হয় যখন গ্রাম বা শহরের জনজীবনে তার ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

অতএব সমাজবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল জনসংখ্যা। এই সম্পর্কিত সকল উপাদানকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। সম্পদ, বিপর্যয় এবং আকস্মিক ঘটনা বা দুর্যোগ প্রভৃতি শব্দ জনজীবনের সাথে জড়িত হয়েই অর্থবহ হয়ে ওঠে। পরিবেশের সকল উপাদানকে উপলব্ধি করতে হলে জনসংখ্যা, জনসংখ্যার বণ্টন ও বৃদ্ধি এবং বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি প্রভৃতি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণালাভ করতে হবে। পৃথিবীর সকল সম্পদ মানুষ একাধারে উৎপাদন করে ও ব্যবহার করে। সুতরাং কোনো একটি দেশের লোকসংখ্যার পরিমাণ, কোথায় এবং কীভাবে বাস করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারতের আদমশুমারি থেকে দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারি।

প্রাথমিকভাবে জনসংখ্যাবিষয়ক তিনটি প্রশ্ন আমাদের উদ্বিগ্ন করছে-

ক) জনসংখ্যার আকৃতি ও বণ্টন : ভারতে কত মানুষ আছে এবং তারা কোথায় বাস করে ?

খ) জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া : সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি পায় এবং পরিবর্তিত হয় ?

গ) জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য এবং গুণগত মান : জনগণের বয়স, লিঙ্গ অনুপাত, সাক্ষরতার হার, পেশাগত কাঠামো এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থা কীরূপ ?

জনসংখ্যার আকৃতি এবং বণ্টন
(Population Size and Distribution)

ভারতে জনসংখ্যার আকৃতি ও সংখ্যা দ্বারা বণ্টন –

২০১১ সালের মার্চ মাসের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ১২১০ মিলিয়ন (১০ লক্ষ = ১ মিলিয়ন) যা পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৭·৫ শতাংশ। ভারতের আয়তন অর্থাৎ ৩·২৮ মিলিয়ন বর্গ কিমি, যা পৃথিবীর মোট আয়তনের ২·৪ শতাংশ, তবে বিশাল আকৃতির এই দেশে ১·২১ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ মিলিয়ন) জনসংখ্যা অসমভাবে বণ্টিত (চিত্র ৬.১)।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, যার লোকসংখ্যা ১৯৯ মিলিয়ন। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৬ শতাংশ লোক উত্তরপ্রদেশে বাস করে। অপরদিকে

আদমশুমারি (Census) বা জনগণনা

একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সরকারিভাবে কোনো দেশের জনসংখ্যার আনুমানিক হিসেবকে জনগণনা বা আদমশুমারি বলে। ১৮৭২ সালে ভারতে প্রথম জনগণনা অনুষ্ঠিত হলেও ১৮৮১ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ জনগণনা হয়। তারপর থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা করা হয়।

ভারতের আদমশুমারি হল, জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহের নির্ভরযোগ্য উৎস। তুমি কি কখনও জনগণনার রিপোর্ট দেখেছ? তোমার গ্রন্থাগারে এমন রিপোর্ট খুঁজে পাও কি না দেখো।

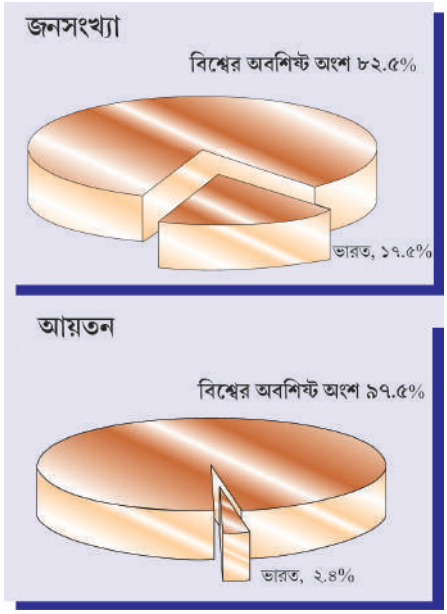

চিত্র ৬·১ : পৃথিবীতে ভারতের আয়তন এবং জনসংখ্যা।

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সিকিমের জনসংখ্যা মাত্র ০.৬ মিলিয়ন এবং লাক্ষাদ্বীপে মাত্র ৬৪৪২৯। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ মাত্র পাঁচটি রাজ্যে বাস করে। রাজ্যগুলি হল — উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ। রাজস্থান ভারতের বৃহত্তম রাজ্য হলেও ভারতের মোট জনসংখ্যা মাত্র ৫·৫ শতাংশ লোক বাস করে (চিত্র ৬.২)।

বের করো : ভারতের জনসংখ্যার অসমবণ্টনের কারণ কী ?

জনঘনত্ব অনুসারে ভারতের জনবণ্টন :

জনঘনত্ব অনুসারে দেশের অসম জনবণ্টনের চিত্র সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার দ্বারা ওই অঞ্চলের জনঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়। ভারত পৃথিবীর সর্বাধিক জনঘনত্বপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি।

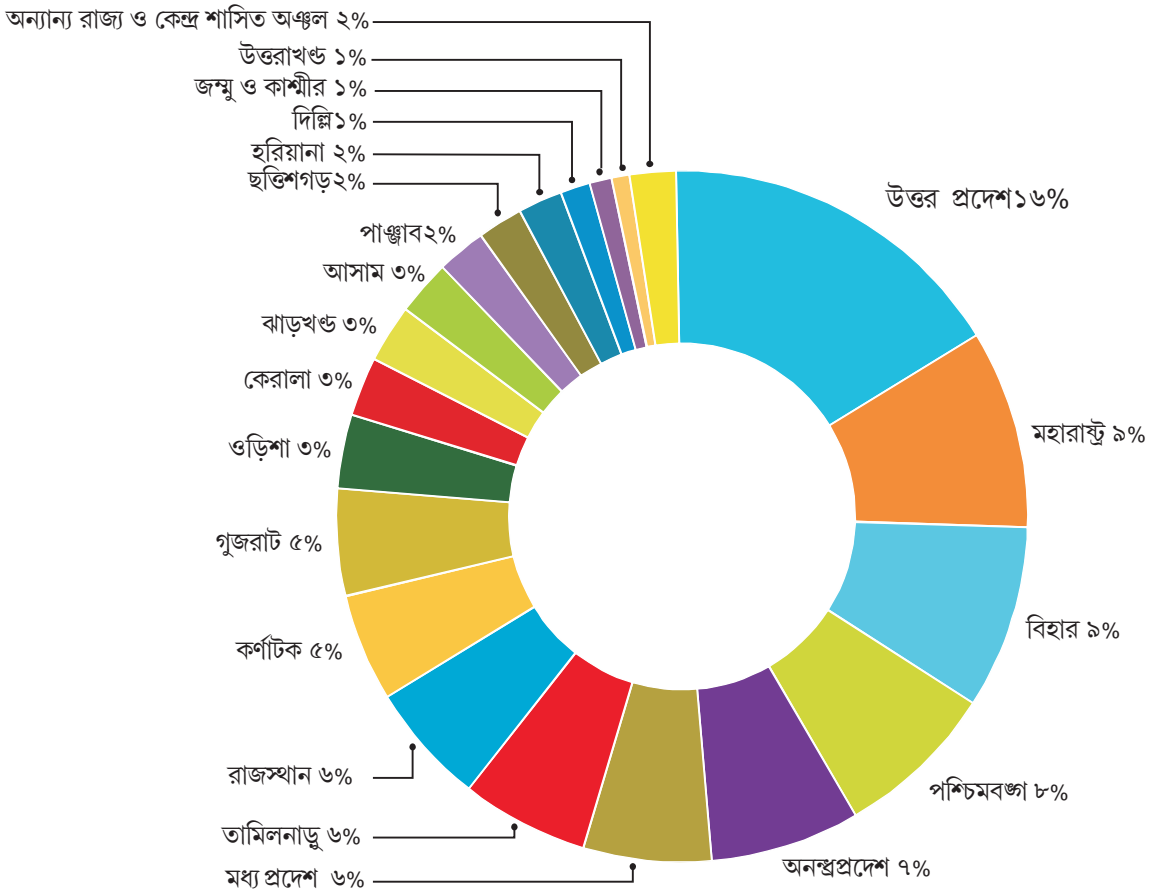

উৎস : ভারতের জনগণনা - ২০১১

চিত্র ৬.২ : ভারতের জনসংখ্যার বণ্টন

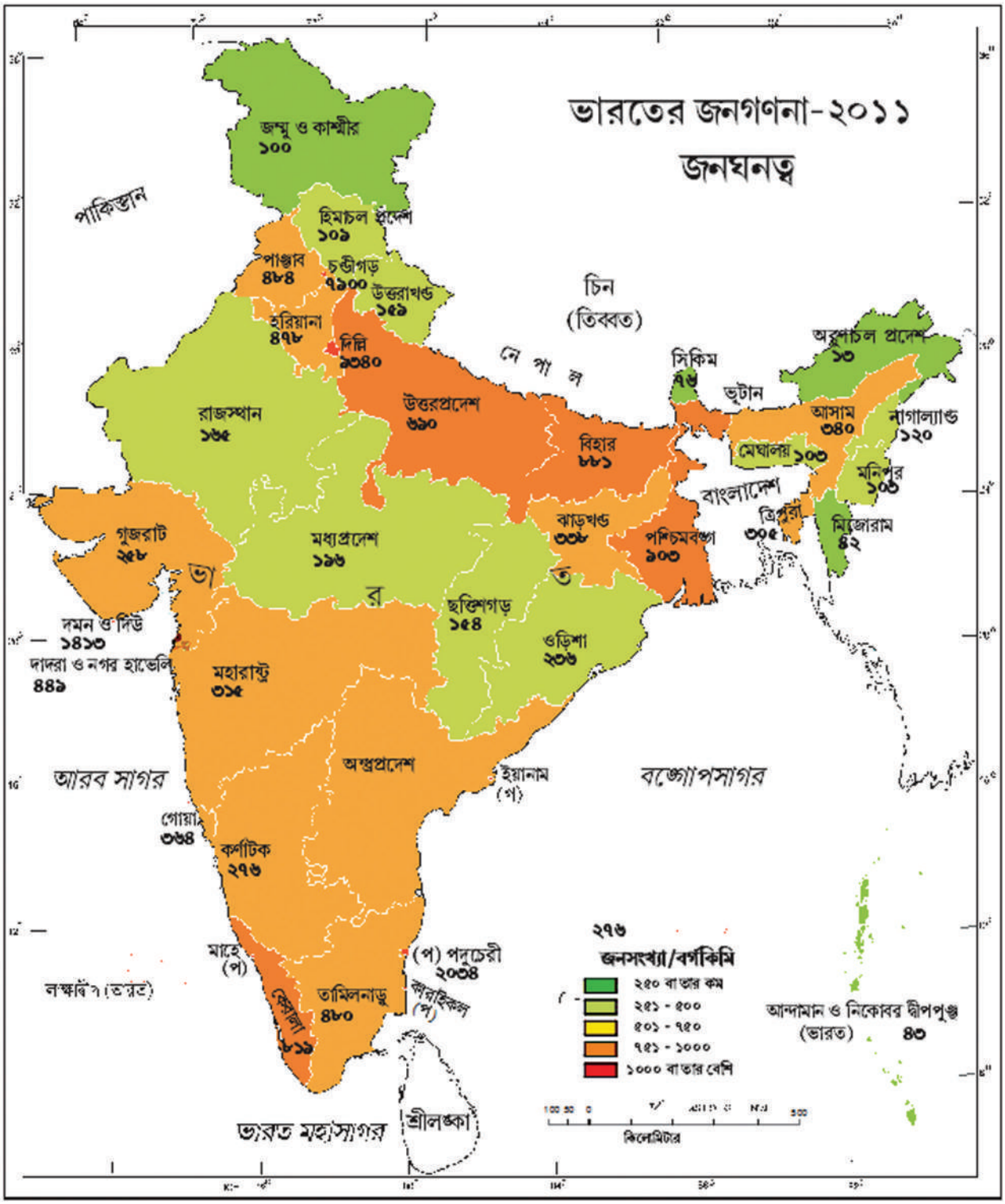

চিত্র ৬·৩ : ভারতের জনঘনত্ব - ২০১১

উল্লেখ্য : জুন, ২০১৪ সালে ঘোষিত হয় তেলেঙ্গানা ভারতের উনত্রিশ (২৯) তম রাজ্য ।

জান কি ? শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও জাপানের গড় জনঘনত্ব ভারতের থেকে বেশি। বাংলাদেশ ও জাপানের জনঘনত্ব বের করো।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের জনঘনত্ব ছিল প্রতিবর্গ কিমিতে ৩৮২ জন। তবে এই জনঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। বিহারের জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমিতে ১১০২ জন, অপরদিকে অরুণাচলে ছিল প্রতিবর্গ কিমিতে মাত্র ১৭ জন। ৬.৩ চিত্রে রাজ্যভিত্তিক জনঘনত্বের অসমবণ্টন সুস্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে।

কাজ

চিত্র ৬.৩ লক্ষ করো এবং চিত্র ২·৪ এবং ৪·৭ এর সাথে তুলনা করো। তুমি কি এই মানচিত্রগুলোর মধ্যে কোনো আঃন্ত সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছ ?

প্রতি বর্গ কিমিতে ২৫০ জনের কম লোকবসতিযুক্ত রাজ্যগুলোর নামের একটি তালিকা তৈরি করো। এ সকল অঞ্চলে বিরল জনবসতির প্রাথমিক কারণ হল বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি ও প্রতিকূল জলবায়ু। কোন্ কোন্ রাজ্যের জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমিতে ২৫০ জনের কম ?

আসাম এবং ভারতের উপদ্বীপীয় অংশের রাজ্যগুলোতে জনঘনত্ব মাঝারি প্রকৃতির। পার্বত্য, বিক্ষিপ্ত, ও পাথুরে ভূ-প্রকৃতি, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত, সংকীর্ণ ও অনুর্বর মাটি প্রভৃতি দ্বারা এ সকল অঞ্চলের জনঘনত্ব প্রভাবিত হয়।
পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উর্বর মাটিযুক্ত বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকার ফলে উত্তরের সমভূমি ও দক্ষিণের কেরালায় জনবসতির ঘনত্ব অধিক থেকে অধিকতর। উত্তরের সমভূমির অধিক বসতিযুক্ত তিনটি রাজ্যের নাম লেখো।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও তার কারণ (Population Growth & Processes of Population Change) :

জনসংখ্যা হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। জনসংখ্যার গঠন ও বণ্টন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। তিনটি প্রধান কারণ এই পরিবর্তনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এগুলো হল– জন্ম, মৃত্যু এবং পরিব্রাজন।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি :

জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলতে কোনো দেশের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট সময়, কমপক্ষে দশ বছর পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসাধারণের বৃদ্ধিকে বোঝায়। এই ধরনের পরিবর্তনকে সাধারণত দুভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে— প্রকৃত জনসংখ্যা নির্ধারণ এবং বার্ষিক পরিবর্তনের হার।
প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঠিক সংখ্যা যোগ করে দশবছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রসার জানা যায়। অতি সহজভাবে বলা যায়, পূর্ববর্তী জনসংখ্যা (যেমন- ২০০১ সালের জনগণনা)-কে পরবর্তী জনসংখ্যা (যেমন ২০১১ সালের জনগণনা) থেকে বাদ দিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। এটাকেই প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বা গতি। প্রতিবছর তা শতাংশ হিসেবে অধিগত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বছরে ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধির অর্থ হল, ওই বছরে মূল জনসংখ্যার প্রতি ১০০জনে ২জন করে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাই হল জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার।

ভারতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩৬১ মিলিয়ন এবং ২০১১ সালে তা বেড়ে ১২১০ মিলিয়ন হয়েছে।

সারণি ৬.১ : ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও প্রসার

বছর	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	প্রতি দশকে প্রকৃত বৃদ্ধি (মিলিয়ন)	বার্ষিক বৃদ্ধির হার (%)
১৯৫১	৩৬১·০	৪২·৪৩	১·২৫
১৯৬১	৪৩৯·২	৭৮·১৫	১·৯৬
১৯৭১	৫৪৮·২	১০৮·৯২	২·২০
১৯৮১	৬৮৩·৩	১৩৫·১৭	২·২২
১৯৯১	৮৪৬·৪	১৬৩·০৯	২·১৪
২০০১	১০২৮·৭	১৮২·৩২	১·৯৩
২০১১	১২১০·৬	১৮১·৪৬	১·৬৪

সারণি ৬.১ এবং চিত্র ৬.৪(ক) এবং ৬.৪(খ) থেকে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুতগতিতে বেড়েছে। ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩৬১ মিলিয়ন কিন্তু ১৯৮১ সালে তা বেড়ে ৬৮৩ মিলিয়ন হয়েছে, যা জনসংখ্যা দ্রুতবৃদ্ধির পরিচায়ক।

বের করো : ৬.১ সারণি অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও প্রতি দশকে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে, কেন ?

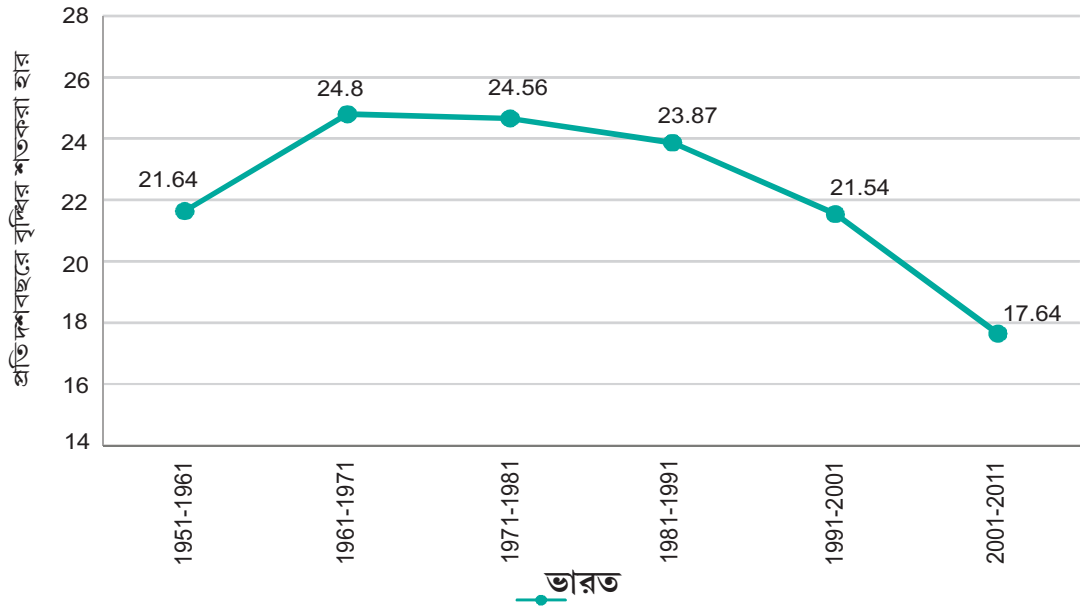

চিত্র ৬.৪ (ক) : ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার - ১৯৫১ থেকে ২০১১

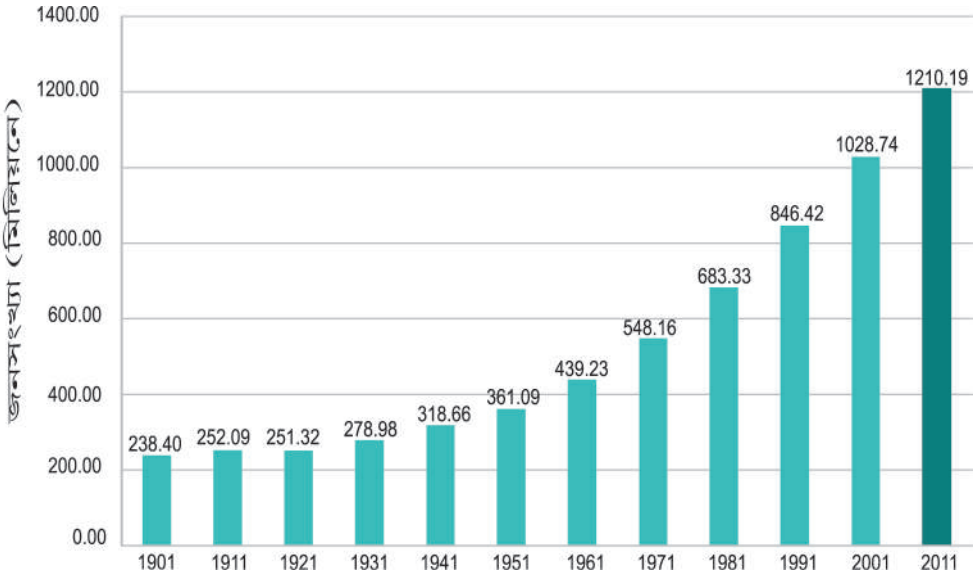

চিত্র ৬.৪ (খ) : ১৯০১-২০১১ সাল পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা।

১৯৮১ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এসময় জন্মহার দ্রুত কমেছে। তাসত্ত্বেও শুধুমাত্র ১৯৯০ সালে মোট জনসংখ্যার সাথে ১৮২ মিলিয়ন জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে (আগে কখনও এভাবে বার্ষিক জনসংখ্যা বাড়েনি।)

এটা জানা অপরিহার্য যে, ভারত একটি বিশাল জনবহুল দেশ। জনবহুল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হলেও প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এক বিলিয়নের বেশি বসতিযুক্ত স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হলেও মোট জনসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। প্রতিবছর

ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে। ভারতে বর্তমানে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৫·৫ মিলিয়ন। বিশাল এই জনসংখ্যার জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি ও পরিবেশ সংরক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসে জন্মনিয়ন্ত্রণ হল একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। তা সত্ত্বেও ভারতের মোট জনসংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ২০৪৫ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা চিনকে অতিক্রম করে পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল দেশে পরিণত হবে।

কাজ

একটি মানচিত্রে, তোমার পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী এবং পিতা-মাতার জন্মের পর পরিব্রাজনের একটি খসড়া তৈরি করো। প্রত্যেকের স্থানান্তর গমনের কারণ অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করো।

জনসংখ্যা পরিবর্তন/বৃদ্ধি প্রক্রিয়া : (Process of Population Change/Growth)

তিনটি প্রধান প্রক্রিয়ার দ্বারা জনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়- ক) জন্মহার খ) মৃত্যুহার এবং গ) পরিব্রাজন। জন্মহার ও মৃত্যুহারের ওপর জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে পার্থক্য দেখা যায়।

ক) জন্মহার – জন্মহার বলতে বছরে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় কতজন শিশুর জন্ম হয় তা বোঝায়। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল মৃত্যুহার অপেক্ষা জন্মহার অনেক বেশি।

খ) মৃত্যুহার – মৃত্যুহার বলতে বছরে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় কতজন মানুষ মারা গেছে তা বুঝায়। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো মৃত্যু হারের দ্রুত হ্রাস।

১৯৮০ সাল পর্যন্ত জন্মহার বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার ফলে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। এরফলে ভারতে উচ্চহারে জনসংখ্যা বাড়ছে। ১৯৮১ সাল থেকে জন্মহার ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও নিম্নমুখী। এরূপ অবস্থার কারণ কী ?

গ) পরিব্রাজন – জনসংখ্যা বৃদ্ধির তৃতীয় উপাদানটি হল পরিব্রাজন। কোনো অঞ্চল বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মানুষের স্থানান্তর গমনকে পরিব্রাজন বলে। পরিব্রাজন দু-ধরনের হতে পারে– অভ্যন্তরীণ (দেশের অভ্যন্তরে) এবং আন্তর্জাতিক (দুটো দেশের মধ্যে)।

অভ্যন্তরীণ পরিব্রাজন দ্বারা জনসংখ্যার আকৃতির পরিবর্তন না হলেও দেশের জনসংখ্যাবণ্টনকে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যার গঠনগত পরিবর্তন ও বণ্টনে পরিব্রাজন একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ভারতে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে পরিব্রাজনের প্রধান কারণ হল গ্রামাঞ্চলের "Push Factor" বা "পুশ ফ্যাক্টর"। এগুলো হল গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতারূপ প্রতিকূল পরিবেশ, কর্মসংস্থানের অভাব প্রভৃতি। অপরদিকে, শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের ক্রমবর্ধমান সুযোগ ও উন্নত জীবনযাপনের সুবিধা "Pull Factor" বা "পুল ফ্যাক্টর"-রূপে মানুষকে শহরের প্রতি আকৃষ্ট করে।

জনসংখ্যা পরিবর্তনে পরিব্রাজন একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। এটা শুধুমাত্র জনসংখ্যার আকৃতিকেই পরিবর্তন করে না, বরং শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার বয়স ও লিঙ্গবিন্যাসকেও প্রভাবিত করে। ভারতে গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজনের ফলে শহর ও নগরের জনসংখ্যার হার দ্রুত বাড়ছে। ১৯৫১ সালে শহরের জনসংখ্যা ১৭·২৯ শতাংশ থাকলেও ২০১১ সালে তা বেড়ে ৩১·৮০ শতাংশ হয়েছে। শুধুমাত্র একদশক, অর্থাৎ ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পরিব্রাজনের ফলে মহানগর (Million plus cities)-এর সংখ্যা ৩৫টি থেকে ৫৩টি হয়েছে।

বয়স ভিত্তিক বিন্যাস (Age Composition):

বয়সভিত্তিক জনবিন্যাস বলতে কোন দেশের বিভিন্ন বয়সের মানুষের মোট সংখ্যাকে বোঝায়। এটি জনসংখ্যার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কোনো একটি মানুষের বয়স অনুসারে তার চাহিদা, ক্রয়ক্ষমতা, কার্যক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। ফলস্বরূপ, শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিণত বয়সের জনসংখ্যার শতকরা সংখ্যা ওই অঞ্চলের জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

দেশের জনসংখ্যা কাঠামোকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়— শিশু, প্রাপ্ত বয়স্ক বা পরিণত এবং বয়স্ক।

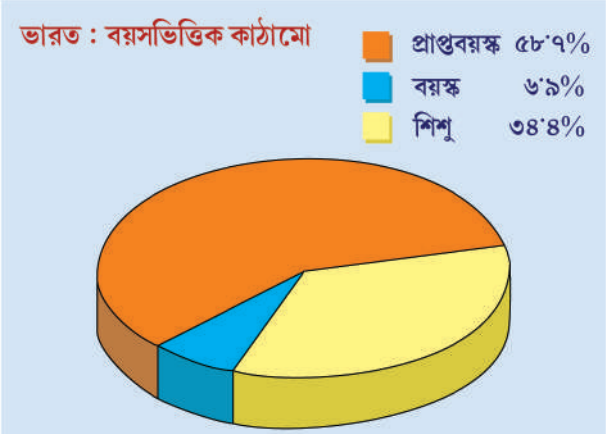

চিত্র ৬.৫ - ভারত : বয়সভিত্তিক জনবিন্যাস

ক) শিশু (সাধারণত ১৫ বছরের কম বয়স) : তারা অর্থনৈতিক ভাবে উৎপাদনে অক্ষম এবং তাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিসেবা প্রভৃতি সরবরাহ করতে হয়।

খ) প্রাপ্তবয়স্ক বা পরিণত (১৫ - ৫৯ বছর) : তারা অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনে সক্ষম এবং জৈবিকভাবে প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন। তারাই কর্মক্ষম জনসংখ্যারূপে পরিচিত।

গ) বয়স্ক (৫৯ বছরের বেশি) : যদিও তারা অবসরপ্রাপ্ত, তা সত্ত্বেও তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনে সক্ষম। তাঁরা স্বেচ্ছায় কাজ করতে পারে তবে তারা নিয়োগের মাধ্যমে চাকরি পেতে পারে না। শিশু এবং বয়স্করা উৎপাদনশীল নয় বলে তাই তাঁরা প্রাপ্তবয়স্কদের উপর নির্ভরশীল। ৬.৫ নং চিত্রে ভারতের জনসংখ্যার এই তিনটি শ্রেণি সম্পর্কে পূর্বেই দেখানো হয়েছে।

কাজ

ক) তুমি কি জান তোমার অঞ্চলে কতজন শিশু গৃহপরিচালক বা শিশুশ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে ?

খ) তুমি কি জান তোমার অঞ্চলে কতজন প্রাপ্তবয়স্ক চাকরিহীন আছে ?

গ) এর পেছনে কী কারণ আছে বলে তোমার মনে হয় ?

লিঙ্গ অনুপাত (Sex Ratio) :

লিঙ্গ অনুপাত বলতে প্রতি এক হাজার জন পুরুষে নারী কতজন তার অনুপাতকে বুঝায়। এই তথ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো সমাজের আনুপাতিক হার জানা যায়। দেশের লিঙ্গ অনুপাতে নারীদের সংখ্যা সর্বদা অসন্তোষজনক। এরূপ হওয়ার কারণ খুঁজে বের করো। নিচের ৬.২ নং ছকে ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত লিঙ্গ অনুপাত দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬.২ : ভারত : নারী-পুরুষ অনুপাত ১৯৫১ - ২০০১

জনগণনা (বছর)	লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী)
১৯৫১	৯৪৬
১৯৬১	৯৪১
১৯৭১	৯৩০
১৯৮১	৯৩৪
১৯৯১	৯২৯
২০০১	৯৩৩
২০১১	৯৪৩

জান কি ? কেরালার লিঙ্গ অনুপাত হল - প্রতি ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ১০৮৪ জন। পুদুচেরিতে ১০০০ জন পুরুষে ১০৩৮ জন নারী। অথচ দিল্লিতে ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ৮৬৬ জন এবং হরিয়ানাতে মাত্র ৮৭৭ জন।

বের কর : এই পার্থক্যের কারণ কী হতে পারে?

সাক্ষরতার হার (Literacy Rates) :

জনসংখ্যার একটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য হল সাক্ষরতা। কেবলমাত্র শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান নাগরিকই গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগ্রহণের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নিরক্ষরতা বা স্বল্পশিক্ষা হল কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে সাক্ষর বলতে সাত বছর বয়সী কোনো ব্যক্তির যে কোনো ভাষা পড়তে ও শিখতে পারাকে বোঝায়। ভারতে শিক্ষিতের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল ৭৩ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী শিক্ষার হার যথাক্রমে ৮০·৯ শতাংশ ও ৬৪·৬ শতাংশ। এরূপ পার্থক্য কেন হয়েছে ?

পেশাগত কাঠামো (Occupational Structure) :

কোনো দেশের অগ্রগতিতে সে দেশের জনগণের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের শতকরা হার হল প্রধান সূচক। পেশাগত তারতম্য অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টনকে পেশাগত কাঠামো বলে অভিহিত করা

হয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে পেশাগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। পেশাকে সাধারণত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং পরিসেবামূলক — এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

ক) প্রাথমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপ – কৃষি, পশুপালন, বনজ সম্পদ সংগ্রহ, মৎস্যশিকার, খনিজোত্তলন ও পাথর অনুসন্ধান প্রভৃতি প্রাথমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপের অন্তর্গত।

খ) মাধ্যমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপ – শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন, কলকারখানা এবং নির্মাণ কাজ প্রভৃতি মাধ্যমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপের অন্তর্গত।

গ) পরিসেবামূলক ক্রিয়াকলাপ -- পরিবহণ, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন ও অন্যান্য সেবাজাতীয় কাজ পরিসেবামূলক কাজের অন্তর্গত।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন উন্নত দেশগুলিতে মাধ্যমিক ও পরিসেবামূলক ক্ষেত্রে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা বেশি। অপরদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অধিকাংশ জনগণ প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত। ভারতে শুধুমাত্র ৬৪ শতাংশ জনগণ কৃষিকাজে নিয়োজিত। অপরদিকে, প্রায় ১৩ শতাংশ মাধ্যমিক এবং প্রায় ২০ শতাংশ সেবামূলক কাজের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে মাধ্যমিক ও পরিসেবামূলক কাজের দিকে জনগণের পেশা পরিবর্তিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য (Health) :

জনংখ্যাবিন্যাসে স্বাস্থ্য হল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। সরকারি কর্মসূচির ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে। ১৯৫১ সালে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি ১০০০ জনে ২৫ জন, ২০১১ সালে তা কমে প্রতি ১০০০ জনে ৭·২ জন হয়। আবার মানুষের গড় আয়ু ১৯৫১ সালে ৩৬·৭ বছর থাকলেও ২০১১ সালে বেড়ে ৬৭·৯ বছর হয়েছে।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, সংক্রামিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ এবং আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগনির্ণয় ও রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বহুবিধ কারণের ফলে জনগণের গড় আয়ুতে এই উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও স্বাস্থ্য পরিস্থিতিই হল ভারতের প্রধান উদ্বেগের বিষয়। মাথাপিছু ক্যালোরির পরিমাণ অনুমোদিত স্তর থেকে অনেক কম এবং দেশের জনগণের একটা বৃহৎ অংশ অপুষ্টিতে ভোগে। গ্রামাঞ্চলের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জনগণ বিশুদ্ধ জল ও শৌচাগারের সুবিধা ভোগ করে। এসকল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য একটি সুষ্ঠজননীতি প্রয়োজন।

কিশোর জনসংখ্যা (Adolescent Population) :

ভারতের জনসংখ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল কিশোর জনসংখ্যার আকার। ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হল কিশোর। কিশোর বলতে সাধারণত যাদের বয়স ১০ থেকে ১৯ বছর তাদেরকে বোঝায়। এই জনসংখ্যা দেশের ভবিষ্যত এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সাধারণত শিশু এবং বয়স্কদের চেয়ে কিশোরদের পুষ্টির প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে বেশি। স্বল্প পুষ্টি বা পুষ্টির অভাব তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। যদিও ভারতে কিশোর-কিশোরীদের খাদ্যের মধ্যে সকল পুষ্টিকর উপাদান অপর্যাপ্ত। কিশোরীদের একটা বৃহৎ অংশ রক্তশূন্যতায় ভোগে। সঠিক স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে তাদের এই সমস্যার প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া হয় না। কিশোরীদের সমুখস্থ এই অবস্থাগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে দেখতে হবে। সাক্ষরতা বিস্তার এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার বীজ বপনের মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জাতীয় জনসংখ্যা নীতি

(National Population Policy) : পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতি ও কল্যাণসাধন করা যায়। এজন্য ভারত সরকার ১৯৫২ সাল থেকে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি (Family Planning Programme) গ্রহন করেছে। পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির যাবতীয় দায়িত্ব স্বেচ্ছাসেবক ভিত্তিতে পিতা-মাতার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। **জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০** কে পরিকল্পনা রূপায়ণের চরম সীমা বলে ধরা হয়েছে।

জাতীয় জনসংখ্যানীতি অনুসারে, এই পরিকল্পনা ২০০০ সালে কার্যকর করা হয়েছে এবং ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সদ্যোজাত শিশু মৃত্যুর হার প্রতি ১০০০ -এ ৩০ জনের কম আনা, অপরিণত মাতৃজঠরে জন্মহার কমানো, রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সব টিকা শিশুদের জন্য সর্বজনীন করা, মেয়েদের দেরিতে বিবাহে উৎসাহিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি এই পরিকল্পনার অন্তর্গত।

জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০ এবং কিশোর (National Population Policy - NPP & Adolescent) :

জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে (NPP- 2000) জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিশোরদের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি কিশোরদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিক, যেমন : অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ প্রতিরোধ ও যৌনসংক্রামিত রোগ থেকে রক্ষা করা (Sxually transmitted diseases - STD) প্রভৃতির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এই নীতিতে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেরিতে বিবাহ ও গর্ভধারণে অনুপ্রাণিত করা ও অবাঞ্ছিত যৌনসংযোগের ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং সুলভ ও নিরাপদ গর্ভনিরোধক পরিসেবা গ্রহণে সচেতন করা প্রভৃতি বিষয়ের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া খাদ্য সম্পূরক প্রদান, পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ এবং বাল্যবিবাহরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

জনগণই হল দেশের প্রধান সম্পদ। কোনো দেশের সুশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যকর জনগণই হল সেই দেশের প্রকৃত শক্তি।

অনুশীলনী

১) নীচের বিকল্পগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

ক) পরিব্রাজনের ফলে জনসংখ্যার যে অংশের সংখ্যা, বণ্টন এবং বিন্যাসে পরিবর্তন হয়, সেটি হল –

অ) প্রস্থান অঞ্চল　　আ) আগমন অঞ্চল

ই) প্রস্থান ও আগমন অঞ্চল　　ঈ) কোনোটিই নয়।

খ) জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ শিশু, কারণ—

অ) উচ্চ জন্মহার　　আ) প্রত্যাশিত উচ্চ আয়ুষ্কাল

ই) উচ্চ মৃত্যুহার　　ঈ) অধিক বিবাহিত দম্পতি।

গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রসার বলতে বোঝায় -

অ) কোনো একটি অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা　　আ) প্রতিবছর যতজন মানুষ ওই অঞ্চলে যুক্ত হয়।

ই) যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়　　ঈ) প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা।

ঘ) ভারতের জনগণনা অনুযায়ী "সাক্ষর" ব্যক্তি বলতে বোঝায় —

অ) যে ব্যক্তি তার নিজের নাম পড়তে ও লিখতে পারে।

আ) যে ব্যক্তি যে-কোনো ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে।

ই) ৭বছর বয়সি কোনো শিশু যে-কোনো ভাষা বুঝে পড়তে ও লিখতে পারে।

ঈ) তিনটি 'R' জানে (পড়া, লেখা, গণনা)।

২) নীচের প্রশ্নগুলোর বিশদভাবে উত্তর দাও :

ক) ভারতে ১৯৮১ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান কেন ?

খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করো।

গ) বয়সভিত্তিক কাঠামো, মৃত্যুহার এবং জন্মহারের সংজ্ঞা দাও।

ঘ) জনসংখ্যা পরিবর্তনে পরিব্রাজন কীভাবে নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে ?

৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
৪) পেশাগত কাঠামো এবং উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?
৫) সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী জনগণের কী কী সুবিধা রয়েছে ?
৬) জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো।

প্রজেক্ট/প্রকল্প

প্রশ্নমালার মাধ্যমে একটি শ্রেণির জনগণনা তৈরি করো। প্রশ্নমালায় কমপক্ষে পাঁচটি প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্নগুলি ছাত্র সম্পর্কিত, তাদের পরিবারের সদস্য, শ্রেণিকক্ষে তাদের সম্পাদিত কাজ, তাদের স্বাস্থ্য- সম্পর্কিত প্রভৃতি বিষয় অনুসারে হবে। প্রত্যেক ছাত্রকে এই প্রশ্নমালার উত্তর দিতে হবে। তথ্যগুলোকে সাংখ্যিকভাবে সংগ্রহ করতে হবে (শতকরা হার)। সংগৃহিত তথ্যকে পাই চিত্র (Pie Chart), স্তম্ভচিত্র (Bar Graph) বা অন্য যে-কোনো আকারে উপস্থাপন করতে হবে।

পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা
(The Hilly Tripura)

৭

চিত্র ৭.১

১. ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন ও অবস্থান :

উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়িরাজ্য ত্রিপুরা। ঐতিহাসিকদের ধারণা ত্রিপুরার রাজা ত্রিপুরের নামে এ রাজ্যের নামকরণ হয়েছে। এর রাজধানী **আগরতলা**।

আয়তন ও বিস্তৃতি : এ রাজ্যের আয়তন ১০,৪৯১ বর্গ কিমি। উত্তর-দক্ষিণে এর বিস্তৃতি প্রায় ১৮৪ কিমি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১১৩ কিমি।

জান কি ? 'ত্রিপুরা' শব্দটি দুটি ককবরক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত 'তুই' এবং 'প্রা'। 'তুই' এর অর্থ হল জল এবং 'প্রা' এর অর্থ হল কাছে।

অবস্থান : ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানকে দুভাগে ব্যাখ্যা করা যায়—

ক) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা অনুসারে :

ত্রিপুরা রাজ্য ২২°৫৬´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°৩২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°১০´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২° ২১´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে বিস্তৃত (চিত্র ৭.২)।

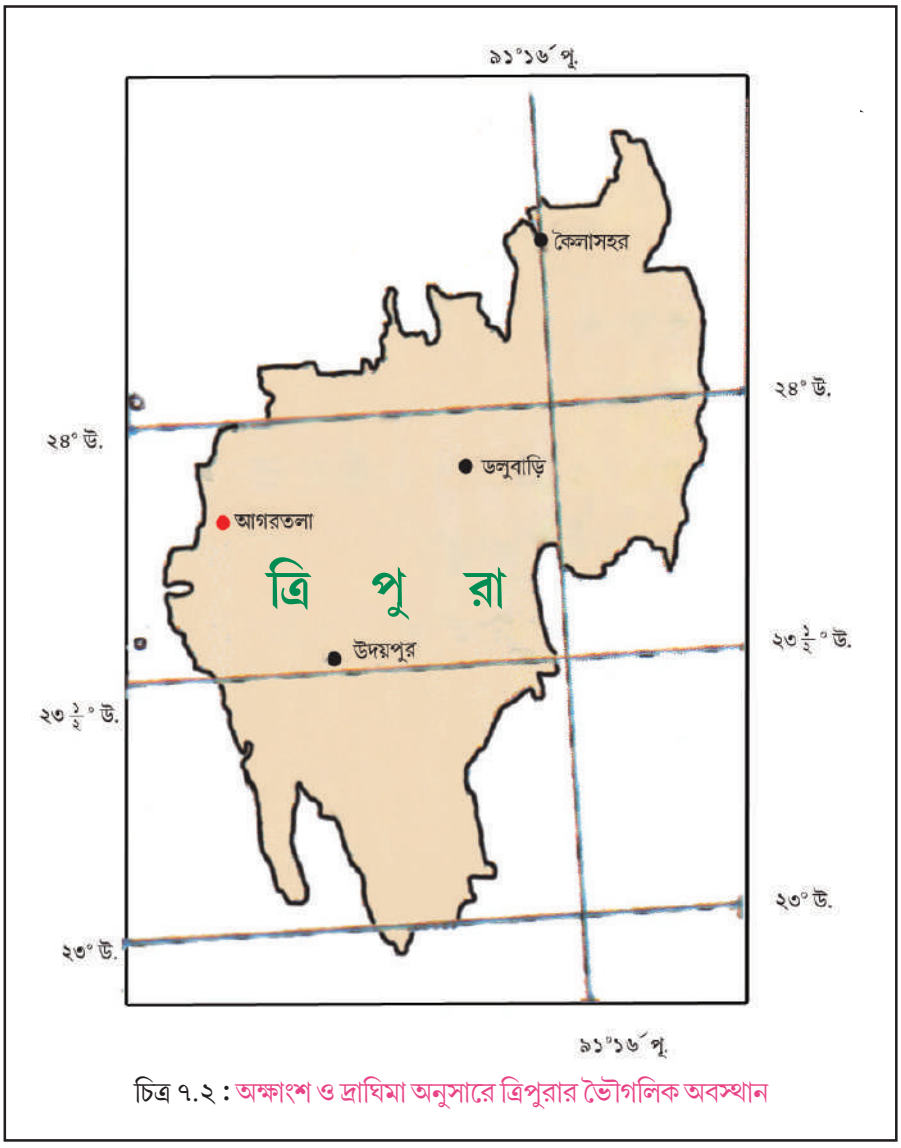

চিত্র ৭.২ : অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা অনুসারে ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থান

মনে রেখো: ত্রিপুরার উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উ.) অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজধানী আগরতলার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২৮০ মিটার ।

খ) দেশীয় অবস্থান অনুসারে :

ত্রিপুরা উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রতিবেশী বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত (৮৩৯ কিমি সীমারেখা)। পূর্বদিকে আছে আসামের কাছাড় ও মিজোরাম। আসামের সঙ্গে সীমারেখা ৫৩ কিমি এবং মিজোরামের সঙ্গে ১০৯ কিমি (চিত্র ৭.১)।

কাজ

পৃথিবী ও ভারতের মানচিত্রে ত্রিপুরার অবস্থান খুঁজে বের কর।

ত্রিপুরারর প্রশাসনিক বিভাগগুলো একনজরে—

জেলার নাম	আয়তন (বর্গ কিমি)	মহকুমা	ব্লক	পঞ্চায়েত	ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম	নগর পঞ্চায়েত
পশ্চিম ত্রিপুরা	৯৪২.৫৫	৩	৯	৮৭	৮৫	২
সিপাহীজলা	১০৪৪.৭৮	৩	৭	১১১	৫৮	১
খোয়াই	১০০৫.৬৭	২	৬	৫৫	৬৯	০
গোমতী	১৫২২.৮	৩	৭	৭০	১০৩	১
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৫৩৪.২	৩	৯	৯৯	৭০	২
ধলাই	২৪০০	৪	৭	৪১	১১০	১
উনকোটি	৫৯১.৯৩	২	৫	৫৯	৩৩	১
উত্তর ত্রিপুরা	১৪৪৪.৫	৩	৮	৬৯	৫৯	১
ত্রিপুরা	প্রায় ১০৪৯.২	২৩	৫৮	৫৯১	৫৮৭	৯

সারণি ১ : উৎস : ত্রিপুরার ইকোনমিক রিভিউ, ২০১৩ - ২০১৪

চিত্র ৭.৩ : ত্রিপুরা (প্রশাসনিক বিভাগগুলো)

২. ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি :

ত্রিপুরা রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও ত্রিপুরাকে তিনটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়— (ক) পাহাড়ি অঞ্চল (খ) তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি ও তৎসংলগ্ন সংকীর্ণ উপত্যকা অঞ্চল (গ) পলিগঠিত সমভূমি।

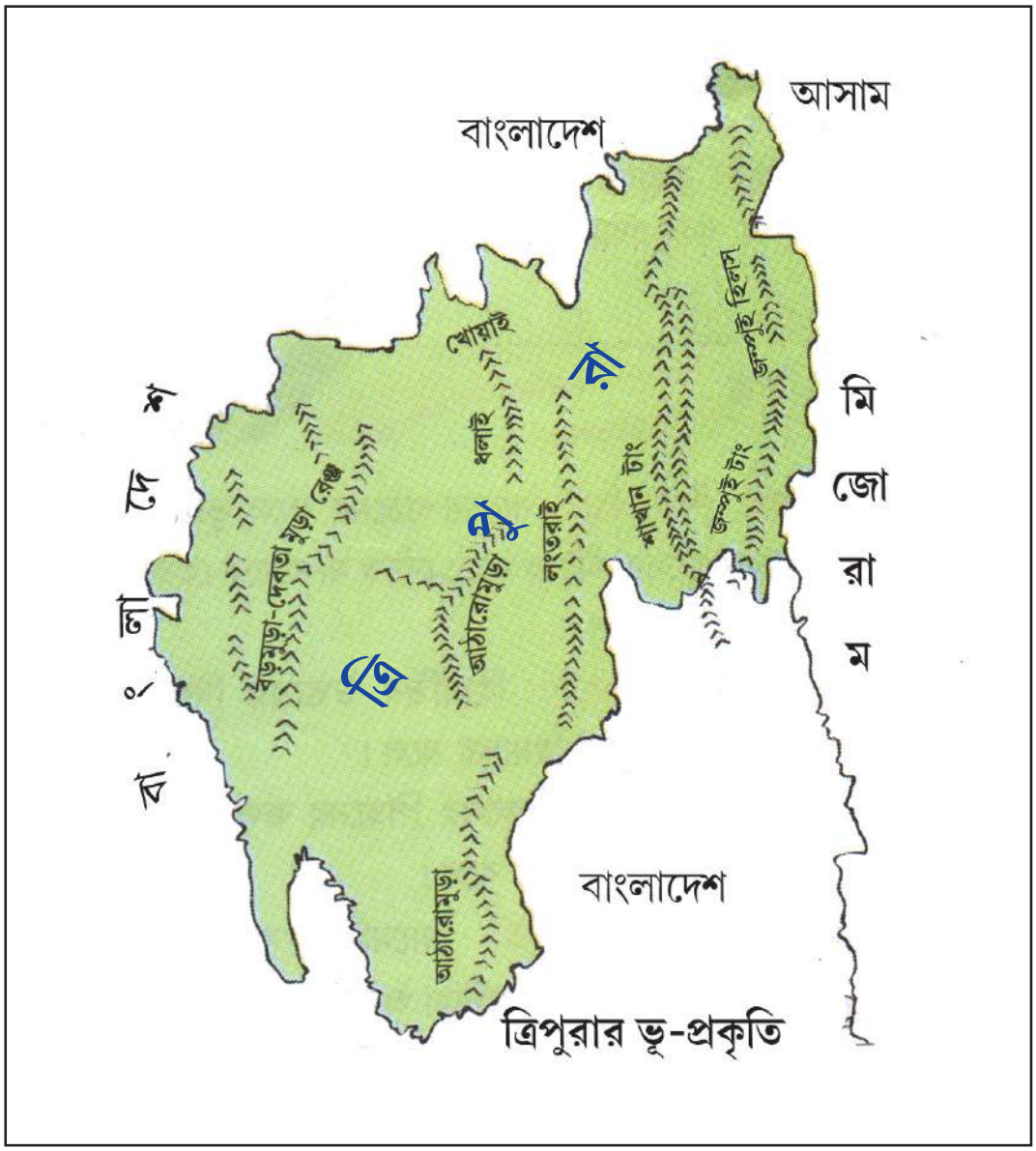

(ক) পাহাড়ি অঞ্চল : সমগ্র উত্তর ত্রিপুরা ও ধলাই জেলা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ জেলার অংশ বিশেষ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ত্রিপুরার প্রধান পাঁচটি পাহাড়শ্রেণি (চিত্র ৭.৪)। তাই ত্রিপুরাকে **'পঞ্চ পাহাড়ের দেশ'** বলা হয়।

পাহাড়শ্রেণিগুলি যথাক্রমে বড়মুড়া - দেওতা মুড়া, আঠারোমুড়া, লংতরাই, শাখানটাং এবং জম্পুই পাহাড়।

ত্রিপুরার **দীর্ঘতম** পাহাড়শ্রেণি হল **আঠারোমুড়া (১০৬ কিমি)** এবং **উচ্চতম** পাহাড়শ্রেণি হল **জম্পুই পাহাড়শ্রেণি**।

ত্রিপুরার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল **বেতলিং শিব**, যার উচ্চতা **৯৩৯ মিটার**।

(খ) তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি ও তৎসংলগ্ন সংকীর্ণ উপত্যকা : ত্রিপুরার পশ্চিম এবং দক্ষিণের অধিকাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। তরঙ্গায়িত উচ্চভূমিগুলির উপরিভাগ মালভূমির ন্যায় সমতল ও ঢালু হয়ে সংলগ্ন সংকীর্ণ উপত্যকার সঙ্গে মিশেছে।

জান কি ? ত্রিপুরাতে সমতল পৃষ্ঠযুক্ত এই উচ্চভূমিকে বলে টিলা, এবং দুটি টিলার মাঝখানে সংকীর্ণ উপত্যকা বিশিষ্ট ভূমিরূপকে বলে লুঙ্গা।

(গ)পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চল : ত্রিপুরার উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। পাহাড়ি উপত্যকাগুলোতে যেখানে নদী অববাহিকা গড়ে উঠেছে সেখানে মৃদু ঢাল যুক্ত পলিগঠিত সমভূমি গড়ে উঠেছে।

গোমতী, হাওড়া, খোয়াই, ফেনি প্রভৃতি নদীর প্রশস্ত প্লাবনভূমিতে যে সমভূমি গড়ে উঠেছে সেখানে নিবিড় কৃষিকার্য হয়ে থাকে।

কাজ

বিভিন্ন নদীর তীরে যে সমভূমি গড়ে উঠেছে তা দেখিয়ে একটি মানচিত্র তৈরি করো।

চিত্র ৭.৫ : ত্রিপুরার নদীসমূহ

৩. ত্রিপুরার নদনদী :

ত্রিপুরায় অনেকগুলো নদী রয়েছে । প্রবাহ অনুসারে নদীগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হল উত্তর বাহিনী নদী ও পশ্চিম বাহিনী নদী (চিত্র ৭.৫)।

উত্তর বাহিনী নদীগুলো হল যথা : মনু নদী, লঙ্গাই নদী, জুরি নদী, ধলাই নদী, খোয়াই নদী, মুহুরি নদী ও দেও নদী।

পশ্চিম বাহিনী নদীগুলো হল যথা : গোমতী নদী, হাওড়া নদী, ফেনি নদী প্রভৃতি। (সারণি ২)

জান কি ? ত্রিপুরার দীর্ঘতম নদী গোমতী।

গোমতী নদী লংতরাই পাহাড়শ্রেণি থেকে রাইমা ও আঠারোমুড়া পাহাড়শ্রেণি থেকে সুরমা নামক দুটি জলধারা গোমতী নাম নিয়ে ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

কাজ
নিচে উল্লিখিত নদীগুলির তীরে অবস্থিত শহরগুলির একটি তালিকা তৈরি করো।

নিম্নের সারণীতে ত্রিপুরার প্রধান নদীগুলোর বিবরণ দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	নদীর নাম	উৎসস্থল	প্রবাহ	দৈর্ঘ্য (কিমি)
১	মনু	শাখানটাং পাহাড়শ্রেণি	উত্তর	১৩৮.০
২	লঙ্গাই	জম্পুই পাহাড়শ্রেণি	উত্তর	৯২.২
৩	জুরি	জম্পুই পাহাড়শ্রেণি	উত্তর	৭৬.০
৪	ধলাই	লংতরাই পাহাড়শ্রেণি	উত্তর	৭৪.১
৫	খোয়াই	লংতরাই পাহাড়শ্রেণি	উত্তর	১৩৩.০
৬	মুহুরী	দেবতামুড়া পাহাড়	উত্তর	৫৩.৩
৭	দেও	জম্পুই পাহাড়শ্রেণি	উত্তর	১১৭.০
৮	গোমতী	লংতরাই ও আঠারোমুড়া পাহাড়শ্রেণি	পশ্চিম	১৮০.০
৯	হাওড়া	বড়মুড়া পাহাড়শ্রেণি	পশ্চিম	৪৭.২১
১০	ফেনী	পার্বত্য চট্টগ্রাম	পশ্চিম	১১৬.০

সারণি-২

৪. ত্রিপুরার জলবায়ু :

ত্রিপুরার উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½ উত্তর অক্ষাংশ) বিস্তৃত, এই রাজ্যের জলবায়ু দুটি ঋতুকালীন বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত তথা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি এবং উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু। তাই এখানকার জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির। কর্কটক্রান্তিরেখার অবস্থানে পাহাড়ি অঞ্চলে উষ্ণতা কিছুটা বেশি হলেও ত্রিপুরার বেশ কিছুটা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত হওয়ায় গরম ততটা অসহ্য মনে হয় না। গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা ২৪°-৩৬° সে. এবং শীতকালীন হাড় উষ্ণতা ১৩° — ২৭° সে.।

জান কি ? ত্রিপুরার আর্দ্রতম মাস হল জুন এবং শুষ্কতম মাস হল ডিসেম্বর। জুলাই ও জানুয়ারি মাসের সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ক্রমান্বয়ে ৮৫% এবং ৫৭%

উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর দিক্ প্রবাহের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে ত্রিপুরার জলবায়ুকে ৪টি ঋতুপর্যায়ে ভাগ করা হয়—

গ্রীষ্মকাল : (মার্চ - মে) — মার্চ মাস থেকে এ রাজ্যে গরম পড়তে শুরু করে। মে মাসে প্রবল ঘূর্ণিঝড় কালবৈশাখী (চিত্র ৭.৬) হয়। প্রতিবছর এতে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। সর্বোচ্চ উষ্ণতা দেখা যায় এপ্রিল মাসে।

চিত্র ৭.৬ : কালবৈশাখী

বর্ষাকাল : (মে মাসের মধ্যভাগ থেকে অক্টোবর)— দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা হিমালয়ে বাধা পেয়ে রাজ্যের পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবল বর্ষণ (চিত্র ৭.৭) করে। এরাজ্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২২৫ সেমি।

চিত্র ৭.৭ : বন্যা প্লাবিত অঞ্চল

শরৎকাল : (অক্টোবর- নভেম্বর) — ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সৃষ্ট উচ্চচাপের কারণে এ সময় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ত্রিপুরা থেকে দ্রুত সরে যেতে থাকে। সূর্যের দক্ষিণায়নের ফলে ত্রিপুরার অবস্থান সূর্য থেকে কিছুটা দূরে হওয়ায় তাপ ক্রমশ কমতে থাকে। বর্ষার শেষভাগে বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে, তা তাপ কমার কারণে ঘনীভূত হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অল্প বৃষ্টিপাত করে।

শীতকাল : (ডিসেম্বর—ফেব্রুয়ারি)– উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এ রাজ্যে নভেম্বরের শেষ দিকে শীত পড়তে শুরু করে। পাহাড়ে উষ্ণতা অনেকটা কমে যায়। ২০১৩ সালের ১১ জানুয়ারি আগরতলার উষ্ণতা কমে দাঁড়িয়েছিল ৪.৮° সে.

মনে রেখো: *ত্রিপুরার মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত (২৮৫৫ মিমি) হয় এবং সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত (১৮১১ মিমি) হয় সোনামুড়ায় ১৯৭২ এর ৩০শে ডিসেম্বর ত্রিপুরায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২° সে.।*

ত্রিপুরার জনজীবনে ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রভাব :

এই জলবায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা থাকে বেশি। প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এতে কোথাও কোথাও বন্যা দেখা যায়। উষ্ণতা ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে ত্রিপুরার কিছু কিছু জায়গায় চা, রাবার ও কফি চাষ হয়। ত্রিপুরা কালবৈশাখীর বিপর্যয় ও মোকাবেলা করে।

কাজ

আবহাওয়া অফিস থেকে সম্প্রতিকালের তথ্য সংগ্রহ করে বারো মাসের ত্রিপুরার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের একটি সারণি তৈরি করো।

৫. ত্রিপুরার স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যজীবন।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ :

ত্রিপুরার মোট আয়তনের (১০,৪৯১ বর্গ কিমি) মধ্যে ৬,২৯২.৬৮১ বর্গ কিমি ভূমিতে বনাঞ্চল (সারণি ৩) আছে। যা মোট আয়তনের প্রায় ৬০ শতাংশ।

রাজ্যে অত্যধিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও উর্বর মৃত্তিকার জন্য গড়ে উঠেছে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ও আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্র অরণ্য (চিত্র ৭.৮)। এখানে প্রধান প্রধান বৃক্ষের মধ্যে হল - শাল, সেগুন, শিশু, গর্জন, আবলুস, মেহগিনি, চাপলাস, তুন, শিমূল, জারুল, পোমা, গামার, জাম, কাঞ্চন এবং নানা ধরনের বাঁশ ও বেত উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কোনো কোনো জায়গায় অর্থকরী বনজ ও কৃষিজ সম্পদ যেমন - বাঁশ, বেত, চা, কফি, রাবার, কাজুবাদাম ও কমলার জন্য বাগিচা সৃষ্টি করা হয়েছে।

জান কি ?

ত্রিপুরার মোট বনাঞ্চলের বিভাজন

বনাঞ্চল	শতাংশ
রিজার্ভ ফরেস্ট বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল	৩৪.২০
প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল	৪.৮৫
সরকারি বনাঞ্চল	২০.৯৩

সারণি ৩

ত্রিপুরার বন্য পশু ও পাখি :

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ত্রিপুরাতে প্রায় ৯০২ ধরনের প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে। সমগ্র ভারতে ১৫টি প্রধান প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে ত্রিপুরায় ৭টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

চশমা বানর ও উল্লুক হল উল্লেখযোগ্য প্রাণী - সারা দেশে চশমা বানরের সংখ্যা সীমিত। ত্রিপুরায় প্রায় ৩৪২ প্রজাতির পাখির

মধ্যে ৫৮টি পরিযায়ী প্রজাতির।

ত্রিপুরায় অরণ্য, বন্যপ্রাণী, পাখি সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছে চারটি অভয়ারণ্য (সারণি ৪)।

আয়তনে প্রথম অভয়ারণ্য গোমতী, দ্বিতীয় তৃষ্ণা, তৃতীয় সিপাহিজলা, চতুর্থ রোয়া।

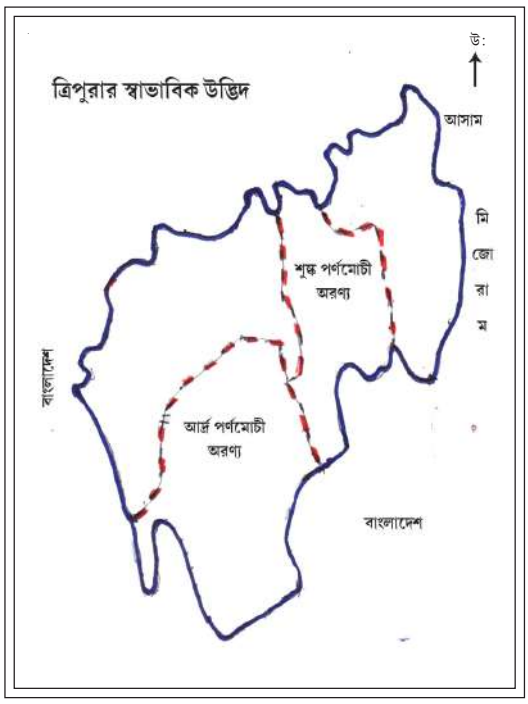

চিত্র ৭.৮

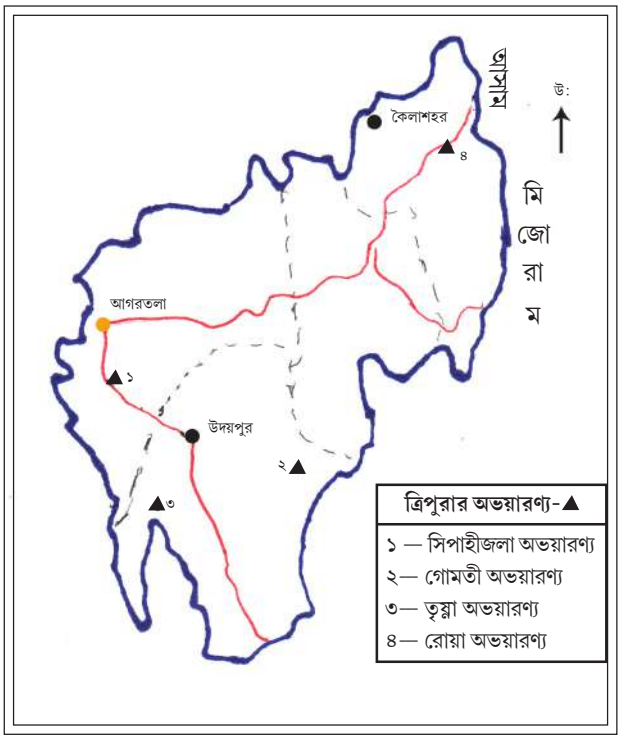

চিত্র ৭.৯ : ত্রিপুরার অভয়ারণ্য

কাজ

উপরে উল্লিখিত বন্যপ্রাণীর মধ্যে কয়টি তুমি দেখেছ, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ক্রমিক নং	অভয়ারন্য	জেলা	গুরুত্বপূর্ণ পশু/পাখি
১	গোমতী (মহকুমা- করবুক)	গোমতী	হাতি, হরিণ, বন্যছাগল, বানর
২	সিপাহিজলা (বিশালগড়)	সিপাহিজলা	চশমা বানর, পরিযায়ী পাখি, উল্লুক, হরিণ ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও পশু ।
৩	তৃষ্ণা (বিলোনিয়া)	দক্ষিণ ত্রিপুরা	বাইসন, নেক, হরিণ, বন্যকুকুর, বানর, কিং কোবরা, স্লো লরিস ইত্যাদি।
৪	রোয়া (ধর্মনগর)	উত্তর ত্রিপুরা	বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও পশু।

সারণি ৪

৬. ত্রিপুরার জনসংখ্যা :

উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য **আয়তনে সপ্তম** হলেও জনসংখ্যা ও জনঘনত্বে **দ্বিতীয় স্থানে** অবস্থান করছে। ২০১১ সালের জনগণনার একটি তথ্য সারণি ৫ নীচে দেওয়া হয়েছে। এই সারণি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ওই সময় ত্রিপুরার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩৬,৭৩,৯১৭ জন। লক্ষ করা যায়, অন্যান্য জেলার তুলনায় **পশ্চিম ত্রিপুরায়** জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব বেশি। কোন অঞ্চলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব তখনই বেশি হয় যখন ওই অঞ্চল সমতল হয়। তাছাড়া শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবিকা সংস্থান এবং প্রশাসনিক ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়— পশ্চিম ত্রিপুরায় এসব কারণে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

জেলাভিত্তিক আনুমানিক জনসংখ্যা (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী)

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলাভিত্তিক লোকসংখ্যার তথ্য নীচে দেওয়া হল —

ক্রমিক নং	জেলা	জনসংখ্যা			প্রতি বর্গ কিমিতে	নারী-পুরুষের হার	স্বাক্ষরতার হার (%)		
		পুরুষ	নারী	মোট	জনঘনত্ব	(প্রতি বর্গকিমিতে)	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	পশ্চিম ত্রিপুরা	৪৬৬১৫২	৪৫২০৪৮	৯১৮২০০	৯৭৪	৯৭০	৯৪.০৪	৮৮.০১	৯১.০৭
২	সিপাহিজলা	২৪৭৮২৯	২৩৫৮৫৮	৪৮৩৬৮৭	৪৬৩	৯৫২	৮৯.৮০	৭৯.৪৯	৮৪.৭৮
৩	খোয়াই	১৬৭৪০১	১৬০১৬৩	৩২৭৫৬৪	৩২৬	৯৫৭	৯২.১৭	৮৩.১৭	৮৬.৬৮
৪	উত্তর ত্রিপুরা	২১২৬৫০	২০৪৭৯১	৪১৭৪৪১	২৪৯	৯৫৩	৯১.২৭	৮৪.৩৯	৮৭.৯০
৫	ঊনকোটি	১৪০২১০	১৩৬২৯৬	২৭৬৫০৬	৪৬৭	৯৭২	৯০.৯২	৪২.৭৯	৮৬.৯১
৬	দক্ষিণ ত্রিপুরা	২২০১৬২	২১০৫৮৯	৪৩০৭৫১	২৮১	৯৫৭	৮৯.৯৬	৭৯.১৬	৮৪.৬৮
৭	গোমতী	২২৫৪২৮	২১৬১১০	৪৪১৫৩৮	২৯০	৯৫৯	৮৯.৯৪	৭৮.৯০	৮৪.৫৩
৮	ধলাই	১৯৪৫৪৪	১৮৩৬৮৬	৩৭৮২৩০	১৫৮	৯৪৪	৯১.৩১	৭৯.৭৯	৮৫.৭২

সারণি ৫ উৎস : ত্রিপুরা সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার মোট জনসংখ্যা ৪০০,০০৪ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা হচ্ছে ২০০,১৩২ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ১৯৯,৮৭২ জন।

কাজ

পশ্চিম ত্রিপুরা ছাড়া অন্যান্য জেলাগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্বের কম হওয়ার কারণগুলো খুঁজে বের করো।

ত্রিপুরার বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিছু প্রশ্ন

১। নীচের চারটি তথ্যের মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও—

ক) ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থান ভারতের—

(অ) উত্তরে (আ) উত্তর-পূর্বে (ই) পশ্চিমে (ঈ) দক্ষিণে

খ) দুই টিলার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উপত্যকাকে ত্রিপুরায় বলে—

(অ) টিলা (আ) সমভূমি (ই) লুঙ্গা (ঈ) শৃঙ্গ

গ) কর্কটক্রান্তি রেখার মান—

(অ) ২৩$\frac{১}{২}^{\circ}$ পূর্ব অক্ষাংশ (আ) ২৩$\frac{১}{২}^{\circ}$ পশ্চিম অক্ষাংশ

(ই) ২৩$\frac{১}{২}^{\circ}$ উত্তর অক্ষাংশ (ঈ) ২৩$\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ

ঘ) ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য একটি বন্যপ্রাণী হল—

(অ) হাতি (আ) বাইসন (ই) হরিণ (ঈ) চশমা বানর

ঙ) মৌসুমি বায়ুর আগমনকালকে বলে —

(অ) গ্রীষ্মকাল (আ) বর্ষাকাল (ই) শরৎকাল (ঈ) শীতকাল।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

ক) ত্রিপুরার উপর দিয়ে অতিক্রান্ত অক্ষরেখাটির নাম কী?

খ) ত্রিপুরার জলবায়ু কোন্ বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়?

গ) ত্রিপুরার বর্তমান লোকসংখ্যা কত?

ঘ) ত্রিপুরার রাজধানীর নাম কী?

ঙ) ত্রিপুরার উচ্চতম পাহাড়শ্রেণি কোন্‌টি?

চ) দুটি পর্ণমোচী উদ্ভিদের নাম লেখো।

ছ) ত্রিপুরার উচ্চতম পাহাড় কোন্‌টি?

জ) ত্রিপুরার উচ্চতম শৃঙ্গ কোন্‌টি?

৩। টিকা লেখো :

ক) পঞ্চপাহাড়ের দেশ

খ) টিলা

গ) লুঙ্গা

ঘ) ত্রিপুরার বন্যপ্রাণী

ঙ) কালবৈশাখী

চ) চিরহরিৎ অরণ্য

ছ) ত্রিপুরার ঋতুপর্যায়

৪। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

ক) ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করো।

খ) ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখো।

গ) পশ্চিম ত্রিপুরায় লোকবসতির ঘনত্ব বেশি কেন?

ঘ) ত্রিপুরার স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঙ) ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য নদীগুলির নাম লেখো।

চ) মৌসুমি বায়ু কীভাবে ত্রিপুরার জলবায়ুকে প্রভাবিত করে?

৫। মানচিত্র দক্ষতা:

ক) গোমতী নদী, হাওড়া নদী।

খ) জম্পুই পাহাড়, আঠারোমুড়া পাহাড়

গ) ত্রিপুরার উপর দিয়ে অতিক্রান্ত কর্কটক্রান্তিরেখা

ঘ) ত্রিপুরার একটি অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল।

ঙ) আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুর।

চ) ত্রিপুরার চারটি অভয়ারণ্য।

শব্দকোষ

কৈশোর (Adolesence)	: কৈশোর হল মানব জীবনের এমন একটি পর্যায় যখন সে শিশুও থাকে না, আবার প্রাপ্তবয়স্কও নয়।
পলিঘটিত সমভূমি (Alluvial Plain)	: যে সমতলভূমিটি নদীবাহিত পলি বা কোমল শিলা দ্বারা গঠিত।
জনসংখ্যার ভিত্তি (Base Population)	: একটি নির্দিষ্ট সময়ের শুরুতে কোনো অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার।
জৈবিক ভর (Biome)	: সমপ্রকৃতির জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবগোষ্ঠী।
জন্মহার (Birth Rate)	: বছরে প্রতি ১০০০ জন মানুষে যতজন শিশুর জন্ম হয়।
নিম্নচাপ (Depression)	: যখন কোনো অঞ্চলে বায়ুমন্ডলীয় চাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকে, আবহবিদ্যায় তখন তাকে নিম্নচাপ নামে অবিহিত করা হয়। সাধারনণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে নিম্নচাপ বেশি দেখা যায়। ভূ-ত্বক অনুসারে পৃথিবীপৃষ্ঠের নিমজ্জিত খাতে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।
মৃত্যুহার (Death Rate)	: বছরে প্রতি ১০০০ জন মানুষে যতজন মানুষ মারা যায়।
জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)	: কোনো নির্দিষ্টস্থানে প্রতিবর্গকিমিতে বসবাসকারী গড় জনসংখ্যা।
নির্ভরতার অনুপাত (Dependency Ratio)	: আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও উৎপাদনশীল (১৫-৫৯ বছর) মানুষের ওপর নির্ভরশীল (১৫ বছরের কম ও ৬০ বছরের বেশি) মানুষের অনুপাত।
বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)	: একটি নিয়মের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী জীবসম্প্রদায়।
পরিবেশ (Environment)	:পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে কোনো ব্যক্তি বা জিনিসের অবস্থার বিকাশ বা উন্নতিসাধন। ইহা প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।
চ্যুতি (Fault)	: পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনো শিলায় অনুভূমিক, উলম্ব বা তীর্যকভাবে রৈখিক ফাটল বরাবর স্থানচ্যুতি ঘটে।
প্রাণীকূল (Fauna)	: একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাণীকূল।
উদ্ভিদকূল (Flora)	: গাছপালা বা উদ্ভিদ দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত অঞ্চল।
ভাঁজ (Fold)	: পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনো একটি অঞ্চল সংকোচনের ফলে শিলাস্তরে সৃষ্ট বাঁক।
মহীখাত (Geosyncline)	: আঙ্গারাল্যান্ড ও গন্ডোয়ানাল্যান্ড থেকে নদীবাহিত পদার্থ সংকীর্ণ, অগভীর, বিস্তীর্ণ অববাহিকারূপে তলদেশে সঞ্চিত অঞ্চল।
হিমবাহ (Glacier)	: মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পর্বতশিখর থেকে ধীর গতিসম্পন্ন বরফস্তূপের প্রবাহ।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভিত্তি (Growth Rate of Population)	: জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বলতে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় তাকে বোঝায়। জনসংখ্যা গণনার বছরের সাথে বর্ধিত জনসংখ্যার তুলনা করা হয়। এই গণনা বার্ষিক বা দশ বছর অন্তর করা হয়।
ভারতের মূল ভূখণ্ড (Indian Mainland)	: এই ভূখণ্ড জম্মু-কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং গুজরাট থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত
ভারতীয় প্রমাণ সময় (Indian Standard Time)	: ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমা (৮২°৩০পূর্ব)-র স্থানীয় সময় ।

অন্তর্বাহিনী নদী (Inland Drainage)	: যে নদীপ্রবাহ সাগর-মহাসাগর পর্যন্ত প্রবাহিত হতে পারে না, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরস্থ সাগর বা হ্রদে পতিত হয়।
আগ্নেয়শিলা (Igneous Rocks)	: ভূগর্ভে বা ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে উত্তপ্ত ম্যাগমা শীতল ও ঘনীভূত হয়ে গঠিত শিলা।
উপহ্রদ (Lagoon)	: পুঞ্জীভূত বালি দ্বারা সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের সাথে যুক্ত লবণাক্ত হ্রদ।
হ্রদ (Lake)	: ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত জলভাগ।
শিলামণ্ডলীয় পাত (Lithospheric Plates)	: ভূপৃষ্ঠের বিশাল অংশ মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় উপাদান দ্বারা গঠিত। এটা অ্যাসথেনোস্ফিয়ারে উপরিভাগে ভাসমান অবস্থায় থাকে।
প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (Life Expectancy)	: একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার প্রত্যাশিত গড় আয়ু।
স্থানীয় সময় (Local Time)	: কোনো স্থানের মধ্যাহ্ন সূর্য দ্বারা নির্ধারিত সময় হল সেই স্থানের স্থানীয় সময়।
রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rocks)	: অতিরিক্ত তাপ ও চাপের ফলে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আগ্নেয় ও পাললিক শিলার আকৃতি ও ধর্ম পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে এই শিলায় পরিণত হয়।
পরিব্রাজন (Migrnation)	: জনসাধারণের স্থানান্তরগমন হল পরিব্রাজন। আভ্যন্তরীণ পরিব্রাজন দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত এবং বৈদেশিক পরিব্রাজনে দুটো দেশের জনসাধারণের স্থানান্তরগমনকে বোঝায়। যখন কোনো দেশের জনগণ একদেশ থেকে অন্যদেশে আসে তখন তাকে বলে অভিবাসন, অপরদিকে তারা যখন সেই দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন তাকে বলে প্রবাস বা দেশান্তরগমন।
মহানগর (Million Plus Cities)	: যে শহরের লোকসংখ্যা এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষের বেশি। (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ)।
মৌসুমি (Monsoon)	: একটি বৃহৎ অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বায়ু প্রবাহিত হয়।
পর্বত (Mountain)	: ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অধিক উচ্চতা বিশিষ্ট এবং সাধারণত খাড়া ঢালযুক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপ।
জাতীয় উদ্যান (National Park)	: স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত প্রাকৃতিক পরিবেশ।
সমভূমি (Plain)	: সমতল পৃষ্ঠ বিশিষ্ট বা মৃদু ঢালযুক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল।
মালভুমি (Plateau)	: সমতল ভূমিভাগ থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ।
পাত সংস্থান (Plate Tectonics)	: বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুসারে, ভূগাঠনিক পাতসমূহের সঞ্চরন।
ভূমিরূপ (Relief)	: সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার পার্থক্য অনুসারে গঠিত ভূমি।
অবনমন (Subsidence)	: আবহবিদ্যায়, বায়ুর নিম্নমুখী প্রবাহকে বোঝায়। ভূতত্ত্ববিদ্যায়, ভূপৃষ্ঠের জলমগ্ন স্থানকে বোঝায়।
পাললিক শিলা (Sedimentary Rocks)	: স্তরে স্তরে পলিসঞ্চিত হয়ে গঠিত শিলা।
লিঙ্গ অনুপাত (Sex Ratio)	: লিঙ্গ অনুপাত বলতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যাকে বোঝায়।
উপমহাদেশ (Sub Continent)	: মহাদেশের বাকি অংশ থেকে স্বতন্ত্র ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি বৃহৎ ভূমিভাগ।
সঞ্চরণ (Tactonic)	: পৃথিবীপৃষ্ঠে উৎপন্ন শক্তি, যা ভূ- গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়।
নবীন পর্বতমালা (Young Mountain)	: অতি সম্প্রতি পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্রমাগত ভাঁজের ফলে ভঙ্গিল পর্বতমালা গঠিত হয়েছে।